মুক্তিপ্রাপ্ত দলের পাথেয়

[Bengali – বাংলা – بنغالي]

মুহাম্মদ ইবন জামীল যাইনূ

৪০৩২

অনুবাদ: ইকবাল হোছাইন মাছুম

সম্পাদনা: ড. আবু বকর মুহাম্মাদ যাকারিয়া

منهاج الفرقة الناجية

محمد بن جميل زينو

ترجمة: إقبال حسين معصوم

مراجعة: د/ أبو بكر محمد زكريا

সূচীপত্র

ভূমিকা

বিসমিল্লাহির রহমানির রাহীম

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের। আমরা তাঁর প্রশংসা করছি, তাঁর সাহায্য প্রার্থনা করছি এবং তাঁর নিকট ক্ষমা চাচ্ছি। অন্তরের অনিষ্ট (কুমন্ত্রণা) এবং মন্দ আমল থেকে তাঁর আশ্রয় প্রার্থনা করছি। যাকে আল্লাহ হিদায়াত দান করেন তাকে কেউ পথভ্রষ্ট করতে পারে না, আর যে গোমরাহ হয়ে যায় তাকে কেউ হিদায়াত দিতে পারে না।

আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, আল্লাহ ছাড়া কোনো মা'বুদ নেই এবং তাঁর কোনো শরীক নেই। আমি আরও সাক্ষ্য দিচ্ছি, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর বান্দা ও রাসূল।

পূর্ব যুগে মানুষের দুঃখ-দুর্দশা বিশেষতঃ মুসলিমদের কষ্ট-মুসিবত, যুদ্ধ-ফিতনা ইত্যাদির কারণ অনুসন্ধান করে দেখা গেছে যে, তাওহীদ সম্পর্কে জ্ঞানের অপ্রতুলতা, উদাসীনতা ও নানা শির্কী কাজে জড়িয়ে পড়াই ছিল এর মূল কারণ। শির্কমুক্ত তাওহীদের চর্চ-অনুশীলন না থাকার সুযোগটি শয়তান গ্রহণ করেছে এবং তাদের বিভ্রান্ত করে বিভিন্ন বিপদে ফেলতে সক্ষম হয়েছে। তাই আমরা এ ছোট্ট বইটিতে তাওহীদ, শির্কসহ ইসলামের বেশ কিছু মৌলিক ও গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে আলোচনা করার চেষ্টা করেছি এবং বইয়ের মাধ্যমেই বিশ্বের সকল ইসলাম অনুসারীকে যাবতীয় শির্কী কর্মকাণ্ড থেকে বিরত থেকে খালেছ তাওহীদের ছায়াতলে অবস্থান নেওয়ার আহ্বান জানাচ্ছি। পাঠকের

সুবিধার কথা বিবেচনায় নিয়ে প্রতিটি বিষয় সংক্ষেপে উপস্থাপন করার চেষ্টা করেছি যাতে তারা বিষয়গুলো সহজে বুঝতে পারে।

এটি রচনার মাধ্যমে আমরা (মুক্তি প্রাপ্ত দলের আক্বীদাহ ও সাহায্যপ্রাপ্ত দলের রাস্তা) খোঁজার চেষ্টা করেছি যাতে ঐ রাস্তায় চলে জয়যুক্ত ও কামিয়াব হতে পারি।

মহান আল্লাহর নিকট আকুল আবেদন, হে আল্লাহ তুমি আমাদেরকে নাযাতপ্রাপ্ত দলের অন্তর্ভূক্ত করে নাও।

শাইখ মুহাম্মাদ ইবন জামীল যাইনু
শিক্ষক, দারুল হাদীস
মক্কা, সৌদি আরব।

জয়যুক্ত দল

১। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿وَٱعۡتَصِمُواْ بِحَبۡلِ ٱللَّهِ جَمِيعٗا وَلَا تَفَرَّقُواْۚ ١٠٣﴾ [آل عمران: ١٠٣]

"আর তোমরা সকলে আল্লাহর রজ্জুকে দৃঢ়ভাবে ধারণ কর এবং বিভক্ত হয়ো না"। [সূরা আলে ইমরান, আয়াত: ১০৩]

২। অন্যত্র বলেন,

﴿وَلَا تَكُونُواْ مِنَ ٱلۡمُشۡرِكِينَ ٣١ مِنَ ٱلَّذِينَ فَرَّقُواْ دِينَهُمۡ وَكَانُواْ شِيَعٗاۖ كُلُّ حِزۡبِۭ بِمَا لَدَيۡهِمۡ فَرِحُونَ ٣٢﴾ [الروم: ٣١، ٣٢]

"তোমরা ঐ মুশরিকদের অন্তর্ভূক্ত হয়ো না, যারা দীনকে টুকরা টুকরা করে ফেলেছে এবং যারা দলে দলে বিভক্ত হয়েছে, প্রত্যেক দল তাদের কাছে যা ছিল তাই নিয়েই খুশি"। [সূরা আর-রূম, আয়াত: ৩১-৩২]

৩। প্রিয় নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

وَقَالَ صلى الله عليه وسلَّمَ: «أُوصِيكُمْ بِتَقْوَى اللَّهِ وَالسَّمْعِ وَالطَّاعَةِ وَإِنْ أُمِّرَ عَلَيْكُمْ عَبْدٌ حَبَشِيٌّ، فَإِنَّهُ مَنْ يَعِشْ مِنْكُمْ فَسَيَرَى اخْتِلَافًا كَثِيرًا، فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ عُضُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ، وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ فَإِنَّ كُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ»

"আমি তোমাদেরকে উপদেশ দিচ্ছি আল্লাহকে ভয় করার, শোনা ও মান্য করার, যদিও তোমাদের আমীর হয় কোনো হাবশী দাস। কারণ, তোমাদের মধ্যে যারা বেঁচে থাকবে নানা মতবিরোধ দেখতে পাবে।

তখন তোমাদের করণীয় হবে, আমার সুন্নত এবং হিদায়াতপ্রাপ্ত খোলাফায়ে রাশেদীনদের সুন্নতকে নিজেদের ওপর অপরিহার্য করে নেওয়া। সেসব সুন্নতকে মুজবুতভাবে, চোয়ালের দাঁত দিয়ে কামড়ে ধরার ন্যায় আঁকড়ে ধরবে। দীনের মধ্যে নতুন কোনো আমল সংযোজনের ব্যাপারে খুবই সাবধান থাকবে। নিশ্চয় সমস্ত নতুন আমলই বিদ‘আত এবং সমস্ত বিদ‘আতই গোমরাহী এবং সমস্ত গোমরাহি জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হবে”।[1]

৪। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরও বলেছেন,

«أَلَا إِنَّ مَنْ قَبْلَكُمْ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ افْتَرَقُوا عَلَى ثِنْتَيْنِ وَسَبْعِينَ مِلَّةً، وَإِنَّ هَذِهِ الْمِلَّةَ سَتَفْتَرِقُ عَلَى ثَلَاثٍ وَسَبْعِينَ: ثِنْتَانِ وَسَبْعُونَ فِي النَّارِ، وَوَاحِدَةٌ فِي الْجَنَّةِ، وَهِيَ الْجَمَاعَةُ»

“ওহে! তোমাদের পূর্বে আগত আহলে কিতাব (ইয়াহূদী ও নাসারা)-রা ৭২ দলে বিভক্ত হয়েছিল এবং এ উম্মত বিভক্ত হবে ৭৩ দলে। ৭২ দল যাবে জাহান্নামে এবং একটি মাত্র দল প্রবেশ করবে জান্নাতে। তারাই হলো (আহলে সুন্নাত ওয়াল) জামা‘আত”।[2]

---

[1] ইবন মাজাহ, হাদীস নং ৪২, আলবানী রহ. হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন। মুসতাদরাক হাকেম, হাদীস নং ৩২৯, তিনি বলেছেন, হাদীসটি সহীহ, এর কোনো ইল্লত নেই। যাহাবী রহ. ও বলেছেন, হাদীসটি সহীহ, এর কোনো ইল্লত নেই।

[2] মুসনাদ আহমদ, হাদীস নং ১৬৯৩৭, আবু দাউদ, হাদীস নং ৪৫৯৭, আলবানী রহ. হাদীসটিকে হাসান বলেছেন।

অন্য হাদীসে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

«كُلُّهُمْ فِي النَّارِ إِلاَّ مِلَّةً وَاحِدَةً، قَالُوا: وَمَنْ هِيَ يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: مَا أَنَا عَلَيْهِ وَأَصْحَابِي».

"একমাত্র আমি এবং আমার সাহাবীদের মতের অনুসারী দল ব্যতীত সকলেই জাহান্নামে যাবে"।[3]

৫। ইবন মাসউদ রাদিয়াল্লাহু 'আনহু থেকে বর্ণিত,

«خَطَّ لَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمًا خَطًّا، وَخَطَّهُ لَنَا عَاصِمٌ فَقَالَ: «هَذَا سَبِيلُ اللهِ» ثُمَّ خَطَّ عَنْ يَمِينِ الْخَطِّ وَعَنْ شِمَالِهِ فَقَالَ: «هَذَا السَّبِيلُ، وَهَذِهِ سُبُلٌ عَلَى كُلِّ سَبِيلٍ مِنْهَا شَيْطَانٌ يَدْعُو إِلَيْهِ» ثُمَّ تَلَا هَذِهِ الْآيَةَ {وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا} [الأنعام: 153] لِلْخَطِّ الْأَوَّلِ، {وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ} [الأنعام: 153] لِلْخُطُوطِ {فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ} [الأنعام: 153] ذَلِكُمْ {وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ} [الأنعام: 153]

"আমাদের জন্য নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একটি দাগ টানলেন। তারপর বললেন: এটা আল্লাহর সোজা (সঠিক) রাস্তা। তারপর তার ডানে ও বামে আরো কিছু দাগ টানলেন। তারপর বললেন: এ রাস্তাগুলোর সবকটিতে শয়তান বসে মানুষদেরকে তার দিকে ডাকছে। এরপর কুরআন থেকে পাঠ করলেন: আর এটি তো আমার সোজা পথ। সুতরাং তোমরা তার অনুসরণ কর এবং অন্যান্য পথ

---

[3] তিরমিযী, হাদীস নং ২৬৪১, তিনি হাদীসটিকে মুফাসসার গরীব বলেছেন। আলবানী রহ. হাসান বলেছেন।

অনুসরণ করো না, তাহলে তা তোমাদেরকে তাঁর পথ থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেবে। এগুলো তিনি তোমাদেরকে নির্দেশ দিয়েছেন, যাতে তোমরা তাকওয়া অবলম্বন কর”।[4]

৬। আব্দুল কাদের জিলানী রহ. তাঁর গুনিয়াতুততালেবীন গ্রন্থে বলেছেন, জয়জুক্ত দল হলো আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা‘আত এবং তাঁদের একমাত্র নাম হলো আসহাবুল হাদীস বা হাদীসের অনুসারী। অর্থাৎ যারা হাদীস ও কুরআন মতে চলে।

৭। আল্লাহ তা‘আলা আমাদের সকলকে হুকুম করছেন: আমরা যেন সকলে কুরআনকে আঁকড়ে ধরি এবং ঐ মুশরিকদের মতো যেন না হই যারা তাদের দীনের মধ্যে দলে দলে, গোত্রে গোত্রে বিভক্ত হয়েছে। আল্লাহর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের জানাচ্ছেন, ইয়াহূদী ও খৃষ্টানরা বহু দলে বিভক্ত হয়েছে। আর মুসলিমরা তাদের থেকেও বেশি দলে বিভক্ত হবে। এই দলে দলে বিচ্ছিন্নতার কারণে তারা জাহান্নামের আগুনে প্রবেশ করবে। তাদের এ বিভক্তির কারণ, হচ্ছে সঠিক পথ হতে বিচ্যুতি, আল্লাহ তা‘আলার কিতাব ও তাঁর রাসূলের সুন্নাহ থেকে দূরে সরে থাকা। তাদের একদল মুক্তি পেয়ে জয়জুক্ত হবে এবং জান্নাতে প্রবেশ করবে। আর তাঁরাই সে দল যারা আল্লাহর কালাম ও মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সহীহ হাদীসকে আঁকড়ে ধরবে এবং সাহাবীদের আমলসমূহ অনুসরণ করবে।

---

[4] মুসনাদ আহমদ, হাদীস নং ১৫২৭৭, শুয়াইব আরনাউত হাদীসটিকে হাসান লিগাইরিহী বলেছেন। নাসাঈ, হাদীস নং ১১১০৯।

নাজাতপ্রাপ্ত দলের রাস্তা (পথ নির্দেশিকা)

১। নাজাতপ্রাপ্ত দল বলে সে দলকে বুঝানো হয়েছে, যারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জীবিত থাকা কালে তাঁর রাস্তাকে আঁকড়ে ধরেছেন দৃঢ়ভাবে। তাঁর ওফাতের পর অনুসরণ করেছেন তাঁর সাহাবীদের রাস্তা। অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি অবতীর্ণ আল-কুরআন প্রদর্শিত এবং তাঁর কর্ম-বক্তব্য-সমর্থনের মাধ্যমে কুরআনের ব্যাখ্যায় যে রাস্তা উদ্ভাসিত হয়েছে। কাল পরিক্রমায় সহীহ হাদীসের মাধ্যমে যা আমাদের পর্যন্ত পৌঁছেছে এবং তিনি নিজ উম্মতকে মজবুতভাতে ধারণ করার নির্দেশ দিয়েছেন সেটিই হলো নাজাতপ্রাপ্ত দলের রাস্তা।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

«تركت فيكم شيئين لن تضلوا بعدهما: كتاب الله وسنتي»

“তোমাদের মধ্যে আমি দুটি জিনিস রেখে যাচ্ছি। যদি তোমরা সেগুলোকে আঁকড়ে ধর তাহলে কখনও পথভ্রষ্ট হবে না। তা হলো আল্লাহর কিতাব ও আমার সুন্নাহ”।[5]

২। সে দলের অনন্য বৈশিষ্ট্য হলো, তারা নিজেদের মাঝে কোনো বিষয়ে মতবিরোধ দেখা দিলে আল্লাহর নির্দেশ পালনার্থে সাথে সাথে আল্লাহর কিতাব ও রাসূলের হাদীসের দিকে প্রত্যার্পণ করে।

আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

---

[5] সহীহ জামে সগীর, হাদীস নং ২৯৩৭, আলবানী রহ. হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন।

﴿فَإِن تَنَٰزَعۡتُمۡ فِي شَيۡءٖ فَرُدُّوهُ إِلَى ٱللَّهِ وَٱلرَّسُولِ إِن كُنتُمۡ تُؤۡمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلۡيَوۡمِ ٱلۡأٓخِرِۚ ذَٰلِكَ خَيۡرٞ وَأَحۡسَنُ تَأۡوِيلًا ٥٩﴾ [النساء: ٥٩]

“অতঃপর কোনো বিষয়ে যদি তোমরা মতবিরোধ কর তাহলে তা আল্লাহ ও রাসূলের দিকে প্রত্যার্পণ করাও- যদি তোমরা আল্লাহ ও শেষ দিনের প্রতি ঈমান রাখ। এটি উত্তম এবং পরিণামে উৎকৃষ্টতর”। [সূরা আন-নিসা, আয়াত: ৫৯]

আল্লাহ আরো বলেন,

﴿فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤۡمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيۡنَهُمۡ ثُمَّ لَا يَجِدُواْ فِيٓ أَنفُسِهِمۡ حَرَجٗا مِّمَّا قَضَيۡتَ وَيُسَلِّمُواْ تَسۡلِيمٗا ٦٥﴾ [النساء: ٦٥]

“অতএব, তোমার রবের কসম, তারা মুমিন হবে না যতক্ষণ না তাদের মধ্যে সৃষ্ট বিবাদের ব্যাপারে তোমাকে বিচারক নির্ধারণ করে, তারপর তুমি যে ফয়সালা দেবে সে ব্যাপারে নিজদের অন্তরে কোনো দ্বিধা অনুভব না করে এবং পূর্ণ সম্মতিতে মেনে নেয়”। [সূরা আন-নিসা, আয়াত: ৬৫]

৩। এ দল আল্লাহ ও রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কথার ওপর কারও কথার প্রাধান্য দেয় না।

কারণ আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বলেন,

﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تُقَدِّمُواْ بَيۡنَ يَدَيِ ٱللَّهِ وَرَسُولِهِۦۖ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَۚ إِنَّ ٱللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٞ ١﴾ [الحجرات: ١]

“হে ঈমানদারগণ, তোমরা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের সামনে অগ্রবর্তী হয়ো না এবং আল্লাহর তাকওয়া অবলম্বন কর, নিশ্চয় আল্লাহ সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ”। [সূরা আল-হুজুরাত, আয়াত: ১]

ইবন আব্বাস রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু বলেছেন, আমার আশঙ্কা হচ্ছে, না জানি তোমাদের ওপর আকাশ থেকে আযাবের পাথর বর্ষিত হয়। আমি তোমাদের বলি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এভাবে বলেছেন, আর তোমরা বল আবু বকর রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু ও উমর রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু এভাবে বলেছেন।

৪। নাজাতপ্রাপ্ত দলের আরো একটি পরিচয় হলো, সর্বক্ষেত্রে তারা তাওহীদকে অগ্রাধিকার দেয়। তাদের সব কথা ও কাজে আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের একত্ববাদের বিকাশ ঘটে, কেবল তাঁরই ইবাদত করে, তাঁর নিকটই সাহায্য প্রার্থনা করে, বিপদে তাঁকেই ডাকে, তাঁর নামেই যবেহ করে, নযর দেয়-মানত করে এবং তাঁর ওপরই তাওয়াক্কুল করে। ইবাদত-বন্দেগি, বিচার-আচার, লেন-দেন এক কথায় জীবনের যাবতীয় কাজ-কর্ম আল্লাহ প্রবর্তিত শরী‘আতের অনুবর্তিতায়ই সম্পাদন করে। এগুলোর ওপর ভিত্তি করেই মূলতঃ সত্যিকারের ইসলামী রাষ্ট্র গঠিত হয়। তবে তাওহীদকে প্রতিষ্ঠিত করতে হলে শির্কের বিষয়টিকে অবহেলা করলে চলবে না। অবশ্যই শির্ককে বিতাড়িত করতে হবে জীবনের সকল ক্ষেত্র থেকে। বর্তমান বিশ্বের অধিকাংশ মুসলিম দেশ প্রকাশ্য-অপ্রকাশ্য ও ছোট-বড় শির্কের সমস্যায় জর্জরিত। আল্লাহর একত্ববাদ প্রতিষ্ঠিত করণ কর্মসূচিকে স্বার্থক করতে হলে অবশ্যই

সেসব শির্ক নির্মূল করতে হবে। কারণ, তাওহীদের দাবিই হচ্ছে যাবতীয় শির্ক দূর করা। শির্কের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিরোধ গড়ে না তুলে এবং তাওহীদকে পশ্চাতে রেখে কোনো দলই আল্লাহর সাহায্য পেতে পারে না। পৃথিবীতে আগমনকারী সকল রাসূলই এসব কথার উত্তম নিদর্শন। আমাদের প্রিয় নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামও এর ব্যতিক্রম নন। তিনি নিজ জীবনে এ সত্য প্রতিষ্ঠিত করে গেছেন স্বার্থকভাবে এবং পরবর্তিদের দেখিয়ে গিয়েছেন সে রাস্তা।

৫। এ দল ইবাদত, চরিত্র গঠন ও যাবতীয় কর্মে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আদর্শ অনুসরণের মাধ্যমে তাঁর সুন্নতকে জীবিত করে। ফলে, নিজেদের সমাজে তারা (স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যের নান্দনিকতায়) অপরিচিত-অচেনা মত হয়ে যায়। এদের সম্বন্ধে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

«بَدَأَ الْإِسْلَامُ غَرِيبًا، وَسَيَعُودُ كَمَا بَدَأَ غَرِيبًا، فَطُوبَى لِلْغُرَبَاءِ»

“ইসলাম শুরু হয়েছিল অপরিচিতর মত এবং আবার ফিরে আসবে অপরিচিতর মত যেমন শুরুতে ছিল। সেই অপরিচিতদের জন্য রয়েছে সুসংবাদ”।[6]

অপরিচিতদের সম্পর্কে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

«فَطُوبَى لِلْغُرَبَاءِ»، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، وَمَا الْغُرَبَاءُ؟ قَالَ: «الَّذِينَ يُصْلِحُونَ عِنْدَ فَسَادِ النَّاسِ»

---

[6] সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ১৪৫।

“ঐ সমস্ত অপরিচিতদের জন্য সুসংবাদ, সাহাবীগণ বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! অপরিচিত কারা? তিনি বললেন, যারা মানুষের সংশোধনে আত্মনিয়োগ করে যখন তারা নষ্ট হয়ে যায়”।[7]

৬। এ দল আল্লাহ ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কথার বাইরে অন্য কারও অন্ধ অনুসরণ করে না। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ছিলেন নির্দোষ (গোনাহ থেকে পবিত্র), মনগড়া কোনো কথা বলেননি। তিনি ছাড়া অন্যান্য মানুষ যতই বড় হোন না কেন ভুল করতে পারেন। কেউই ভুল-ত্রুটির উর্ব্ধে নন।

এ প্রসঙ্গে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

«كُلُّ بَنِي آدَمَ خَطَّاءٌ، وَخَيْرُ الْخَطَّائِينَ التَّوَّابُونَ»

“আদম সন্তান প্রত্যেকেই ভুলকারী। ভুলকারীদের উত্তম ঐ ব্যক্তি যারা তওবা করে। (এবং ভ্রান্ত পথ থেকে ফেরত আসে”।[8]

ইমাম মালেক রহ. বলেছেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ব্যতীত এমন কোনো ব্যক্তি নেই যার সমস্ত কথা গ্রহণ করা যায় অথবা

---

[7] মু'জাম আল-কাবীর, লিত্বতবরানী, হাদীস নং ৫৮৬৭, ইমাম হাইসামী রহ. মাজমা'উজ্জাওয়াদে বলেছেন, হাদীসটি ইমাম তাবরানী মু'জাম আল-কাবীর, আওসাত ও সগীরে বর্ণনা করেছেন, সনদে বকর ইবন সুলাইম ব্যতীত সব রাবী সহীহ, আর তিনি সিকাহ। দেখুন, মাজমা'উজ্জাওয়াদ: হাদীস নং ১২১৯৪, ৭/২৭৮।

[8] ইবন মাজাহ, হাদীস নং ৪২৫১, আলবানী রহ. হাদীসটিকে হাসান বলেছেন। মুসতাদরাক হাকিম, হাদীস নং ৭৬১৭, তিনি সনদটিকে সহীহ বলেছেন, তবে ইমাম বুখারী ও মুসলিম বর্ণনা করেন নি।

পরিত্যাগ করা যায়।

৭। নাজাতপ্রাপ্ত দল হলো তারা যারা হাদীস ও কুরআন অনুযায়ী চলে। যাদের সম্বন্ধে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

«لَا تَزَالُ طَائِفَةٌ مِنْ أُمَّتِي ظَاهِرِينَ عَلَى الْحَقِّ، لَا يَضُرُّهُمْ مَنْ خَذَلَهُمْ، حَتَّى يَأْتِيَ أَمْرُ اللهِ وَهُمْ كَذَلِكَ»

"আমার উম্মতের একটি দল সর্বদা হকের ওপর প্রতিষ্ঠিত ও বিজয়ী থাকবে। আল্লাহর নির্দেশ (কিয়ামত) আসা অবধি যারা তাদের পিছপা-অপমান করবে কোনো ক্ষতি করতে পারবে না"।[9]

৮। এ দল চার মুজতাহিদ ইমামকে যথাযথ সম্মান করে। নির্দিষ্ট কারো অন্ধ অনুসরণ করে না। সকলের থেকেই কুরআন ও ফিকাহ'র মাসআলা গ্রহণ করে। প্রত্যেকের কথাই গ্রহণ করে যদি সে কথা সহীহ হাদীসের সাথে মিলে যায়। তাদের অনুসরণের প্রকৃত রূপ এটিই। কারণ, তাঁরা প্রত্যেকেই নিজ অনুসারীদের সহীহ হাদীস অনুযায়ী আমল করার তাগিদ দিয়েছেন এবং হাদীসের সাথে সাজ্ঘর্ষিক যাবতীয় মতবাদকে ত্যাগ করতে নির্দেশ দিয়েছেন।

৯। এ দল সৎ কাজের আদেশ দেয় এবং অন্যায় কাজে নিষেধ করে। বিদ'আতের সমস্ত রাস্তা ত্যাগ ও অস্বীকার করে। আরো অস্বীকার করে সে সব দলকে যারা ইসলাম ও উম্মতকে শতধা বিভক্ত করছে, দীনের মধ্যে বিদ'আতের প্রবর্তন করছে এবং নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি

[9] সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ১৯২০।

ওয়াসাল্লাম ও সাহাবীদের রাস্তা থেকে নিজেদেরকে দূরে সরিয়ে নিয়েছে।

১০। এ দল সকল মুসলিমকে জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তাঁর সাহাবীদের আদর্শ আঁকড়ে ধরার প্রতি আহ্বান জানায়। যাতে তাঁরা পৃথিবীতে জয়যুক্ত হতে পারেন এবং পরকালে আল্লাহর করুণা ও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শাফায়াতে জান্নাতে প্রবেশ করতে পারেন।

১১। এ দল ইসলাম ও শরী'আত পরিপন্থী মানব রচিত আইন ও বিচারের বিরোধিতা করে। বরং এরা মানব জাতিকে আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের কিতাব অনুযায়ী বিচার কায়েম করার প্রতি আহ্বান করে। আর এতেই রয়েছে তাদের ইহলৌকিক ও পারলৌকিক কল্যাণ। কারণ, এটি মহান আল্লাহর নাযিলকৃত বিধান। তিনিই জানেন কিসে তাদের কল্যাণ আর কিসে অকল্যাণ। তাছাড়া এ কিতাব অপরিবর্তনীয়- সময়ের বিবর্তনের সাথে কখনোই এর পরিবর্তন হবে না। এটি সর্ব কালের সর্ব শ্রেণির লোকদের জন্য প্রযোজ্য। বর্তমান বিশ্বমানবতা বিশেষ করে মুসলিমদের দুর্ভোগ ও পেরেশানির অন্যতম কারণ হচ্ছে তারা আল্লাহর নাযিলকৃত বিধান বাদ দিয়ে মানব রচিত অসার সংবিধানে বিচার কার্য পরিচালনা করছে। জীবনাচারে কুরআন ও সুন্নাহর অনুবর্তন অনুপস্থিত। তাদের অপমান-অপদস্ত হবার এটিই মূল কারণ। এ অবস্থার পরিবর্তন কখনোই হবে না যদি না তারা পরিপূর্ণরূপে ইসলামের শিক্ষার দিকে ফিরে আসে। ব্যক্তিগতভাবে হোক বা

সমষ্টিগতভাবে। সামাজিকভাবে হোক কিংবা রাষ্ট্রীয়ভাবে।

আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

﴿إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوۡمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُواْ مَا بِأَنفُسِهِمۡۗ ١١﴾ [الرعد: ١١]

“নিশ্চয় আল্লাহ কোনো কাওমের অবস্থা ততক্ষণ পরিবর্তন করেন না, যতক্ষণ না তারা নিজেদের অবস্থা পরিবর্তন করে”। [সূরা আর-রাদ, আয়াত: ১১]

১২। এ দল সকল মুসলিমকে আল্লাহর রাস্তায় জিহাদের প্রতি আহ্বান করে। জিহাদ সার্মথ্য অনুযায়ী প্রতিটি মুসলিমের ওপর ফরজ। তবে সে জিহাদ হতে হবে নিচের নিয়ম অনুযায়ী।

প্রথমত: জিহ্বা ও লেখনীর মাধ্যমে। মুসলিম ও অমুসলিম নির্বিশেষে সকল মানুষকে সত্যিকারের ইসলাম আঁকড়ে ধরার দাওয়াত দিতে হবে। আরো দাওয়াত দিতে হবে শির্কমুক্ত তাওহীদ লালন করার প্রতি। আর এ দিকটির দিকে বিশেষ নজর দিতে হবে। কারণ, শির্ক আজ বেশির ভাগ মুসলিম দেশে ছড়িয়ে পড়েছে মহামারির মতো। এ সম্বন্ধে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ভবিষ্যদ্বাণী করে বলেছেন,

«وَلَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تَلْحَقَ قَبَائِلُ مِنْ أُمَّتِي بِالْمُشْرِكِينَ، وَحَتَّى تَعْبُدَ قَبَائِلُ مِنْ أُمَّتِي الْأَوْثَانَ»

“কিয়ামত সংগঠিত হবে না যতক্ষণ না আমার উম্মতের কিছু কবিলা মুশরিকদের সাথে মিলে যায় এবং যতক্ষণ না আমার উম্মতের কিছু

কবিলা (পাথরের) মূর্তি পূজা করে”।[10]

দ্বিতীয়ত: সম্পদের মাধ্যমে। যেমন ইসলাম প্রচার ও দাওয়াত কাজে সম্পদ ব্যয় করা। এ সংক্রান্ত বই-পত্র ছাপিয়ে বিতরণ করা। দুর্বল ঈমানদারদের ঈমানকে মজবুত করে তুলতে বহুমুখী কর্মসূচী গ্রহণ করে তা বাস্তবায়ন কল্পে ব্যয় করা।

তৃতীয়ত: জীবন দিয়ে জিহাদ করা। যেমন, ইসলামকে জয়যুক্ত করার জন্য যুদ্ধ করা। যাতে আল্লাহর কালেমা উঁচু হয় এবং কাফিরদের কথা নীচু হয়।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ দিকে ইঙ্গিত করে বলেছেন,

«جَاهِدُوا الْمُشْرِكِينَ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ وَأَلْسِنَتِكُمْ»

“তোমরা নিজ সম্পদ, জীবন ও জিহ্বার মাধ্যমে মুশরিকদের বিরুদ্ধে জিহাদ কর”।[11]

জিহাদের প্রকার ও তার বিধান

১। ফরযে আইন

কাফিররা কোনো মুসলিম রাষ্ট্রকে আক্রমন করলে তাদের বিরুদ্ধে জিহাদ করা সকল মুসলমানের ওপর সমানভাবে ফরয হয়ে পড়ে। যেমন অধুনা ফিলিস্তীন। যা আজ ইয়াহূদীরা জোর করে দখল করে আছে। এদেরকে সেখান থেকে বিতাড়িত করে মাসজিদুল আকসাকে

---

[10] আবু দাউদ, হাদীস নং ৪২৫২, আলবানী রহ. হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন।

[11] আবু দাউদ, হাদীস নং ২৫০৪, আলবানী রহ. হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন।

মুক্ত করার জন্য জান-মাল দিয়ে অব্যহত প্রচেষ্টা চালিয়ে যাওয়া সামর্থবান সকল মুসলমানের ওপর ফরজ। এ দায়িত্বে কেউ অবহেলা করলে অথবা পদক্ষেপ নিতে বিলম্ব করলে জিহাদ শুরা করা পর্যন্ত সকলে পাপী বলে সাব্যস্ত হবে।

২। **ফরযে কিফায়া**

প্রয়োজনীয় সংখাক মুসলিম এ জিহাদের জন্য তৈরি হয়ে গেলে বাকীরা দায়মুক্তি পেয়ে যাবে।

তবে পৃথিবীর সকল মানুষ যাতে ইসলামী বিধান মেনে চলতে শুরু করে সে লক্ষ্যে ইসলামের দাওয়াত দুনিয়া ব্যাপি ছড়িয়ে দেওয়ার চেষ্টা চালিয়ে যেতে হবে। এ কাজে কেউ বাধা দিলে দাওয়াতের কাজ নির্বিঘ্ন করার জন্য তাদের বিরুদ্ধে জিহাদ করতে হবে।

মুক্তিপ্রাপ্ত দলের নিদর্শনসমূহ

প্রথমত: এদের সংখ্যা খুবই নগণ্য। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের জন্য নিম্নোক্ত দো'আ করেছেন,

«طُوبَى لِلْغُرَبَاءِ، فَقِيلَ: مَنِ الْغُرَبَاءُ يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: أُنَاسٌ صَالِحُونَ، فِي أُنَاسِ سُوءٍ كَثِيرٍ، مَنْ يَعْصِيهِمْ أَكْثَرُ مِمَّنْ يُطِيعُهُمْ»

“সুসংবাদ সে সব অপরিচিতদের জন্য। কিছু সৎলোক যারা অনেক অসৎ লোকের মাঝে (বসবাস করবেন)। তাদের যারা অমান্য করবে

তাদের সংখ্যা মান্যকারীর সংখ্যা অপেক্ষা অধিক হবে”।[12]

পবিত্র কুরআনে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন তাদের প্রশংসা করে বলেন,

﴿وَقَلِيلٌ مِّنۡ عِبَادِيَ ٱلشَّكُورُ ١٣﴾ [سبا: ١٣]

“এবং আমার বান্দাদের মধ্যে অল্পই কৃতজ্ঞ”। [সূরা সাবা, আয়াত: ১৩]

দ্বিতীয়ত: তাদের সঙ্গে বেশির ভাগ লোকেরা শত্রুতা করে। তাদের ওপর নানাবিধ দোষারোপ করে। নানা রকম বিকৃত নাম দিয়ে ঠাট্টা-বিদ্রুপ করে। নবীদের সাথে যে দুর্ব্যবহার করা হত ঠিক সে রকম ব্যবহার তাদের সাথেও করা হয়। আল্লাহ তাদের সম্বন্ধে বলেন,

﴿وَكَذَٰلِكَ جَعَلۡنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوّٗا شَيَٰطِينَ ٱلۡإِنسِ وَٱلۡجِنِّ يُوحِي بَعۡضُهُمۡ إِلَىٰ بَعۡضٖ زُخۡرُفَ ٱلۡقَوۡلِ غُرُورٗاۚ ١١٢﴾ [الانعام: ١١٢]

“আর এভাবেই আমি প্রত্যেক নবীর শত্রু করেছি মানুষ ও জিন্নের মধ্যে শয়তানদেরকে, তারা প্রতারণার উদ্দেশ্যে একে অপরকে চাকচিক্যপূর্ণ কথার কুমন্ত্রণা দেয়”। [সূরা আল-আন‘আম, আয়াত: ১১২]

আমাদের রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন মানুষদের তাওহীদের দিকে ডেকেছিলেন তখন তাঁর কওমের লোকেরা তাঁকে চরম মিথ্যাবাদী ও যাদুকর বলেছিল। অথচ পূর্বে তারা তাঁকে সত্যবাদী ও বিশ্বাসী বলে অভিহিত করত।

---

[12] মুসনাদ আহমদ, হাদীস নং ৬৬৫০, শুয়াইব আরনাউত হাদীসটিকে হাসান লিগাইরিহি বলেছেন।

গ্রান্ড মুফতি শাইখ ইবন বাযকে এদের সম্বন্ধে প্রশ্ন করা হলে তিনি বলেন, তাঁরাই ওরা, যারা সকল কাজে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং তাঁর সাহাবীদের অনুসরণ করে এবং সালাফে সালেহীনের রাস্তায় চলে।

কারা জয়যুক্ত দল?

আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ সম্বন্ধে বলেছেন,

«لَا تَزَالُ طَائِفَةٌ مِنْ أُمَّتِي ظَاهِرِينَ عَلَى الْحَقِّ، لَا يَضُرُّهُمْ مَنْ خَذَلَهُمْ، حَتَّى يَأْتِيَ أَمْرُ اللهِ وَهُمْ كَذَلِكَ»

"আমার উম্মতের একটি দল সর্বদা হকের ওপর প্রতিষ্ঠিত ও বিজয়ী থাকবে। আল্লাহর নির্দেশ (কিয়ামত) আসা অবধি যারা তাদের পিছপা-অপমান করবে কোনো ক্ষতি করতে পারবে না"।[13]

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরও বলেছেন,

«إِذَا فَسَدَ أَهْلُ الشَّامِ، فَلَا خَيْرَ فِيكُمْ، وَلَا يَزَالُ أُنَاسٌ مِنْ أُمَّتِي مَنْصُورِينَ، لَا يُبَالُونَ مَنْ خَذَلَهُمْ حَتَّى تَقُومَ السَّاعَةُ»

"যখন সিরিয়াবাসীরা ফিৎনা ফাসাদে লিপ্ত হয়ে যাবে তখন তোমাদের মধ্যে কোনো মঙ্গল নেই। আমার উম্মতের একদল সর্বদাই জয়যুক্ত হবে কিয়ামাহ পর্যন্ত। যারা তাদের অপদস্ত করতে চাবে তারা তাদের

[13] সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ১৯২০।

কোনোই ক্ষতি করতে পারবে না”।[14]

৩। ইমাম ইবন মোবারক রহ. বলেছেন, তারা হলেন হাদীসের অনুসারী।

৪। ইমাম বুখারী রহ. স্বীয় উস্তাদ আলী ইবন মাদানী রহ. থেকে উদ্ধৃত করে বলেছেন, তারা হচ্ছেন হাদীসের অনুসারী।

৫। ইমাম আহমাদ ইবন হাম্বল রহ. বলেছেন, যদি তারা হাদীসের আনুসারী না হন, তাহলে জানি না তাঁরা কারা।

৬। ইমাম শাফেঈ রহ. ইমাম আহমাদ রহ.-কে বলেছেন, হাদীস সম্বন্ধে তোমরা আমার চেয়ে অভিজ্ঞ। কোনো সহীহ হাদীসের সন্ধান পেলে আমাকে জানাবে। তা হতে আমি মাযহাব (মতবাদ) উৎসারিত করব। হাদীসটি যারাই বর্ণনা করুক, হেজাজবাসী কি কূফাবাসী কিংবা বসরাবাসী।

৭। প্রতি কাজে তাঁরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আদর্শ খুঁজে বের করে সে অনুযায়ী আমল করে। তাঁর চরিত্রের রঙে রঞ্জিত হতে চায়। কোনো ব্যক্তির অন্ধ অনুসরণ করে না। সর্বক্ষেত্রে রাসূলুল্লাহর অনুসরণ করে।

৮। খতীব বাগদাদী রহ. তাঁর আহলুল হাদীস কিতাবে লিখেছেন, কুরআন-সুন্নাহ বাদ দিয়ে যারা নিজ রায় ও মতবাদ অনুযায়ী আমল

[14] মুসনাদ আহমদ, হাদীস নং ১৫৫৯৬, শুয়াইব আরনাউত হাদীসের সনদটিকে সহীহ বলেছেন।

করে। তারা যদি সে সব উপকারী ইলম নিয়ে ব্যস্ত হত এবং সব বিষয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নত তালাশ করত তাহলে দেখতে পেত নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নাতই তাদের জন্য যথেষ্ট। কারণ, মহান আল্লাহর একত্ববাদের সূত্রগুলো, তাঁর সিফাতসমূহ, জান্নাত-জাহান্নামের খবরদি সুসংবাদ হোক কিংবা দুঃসংবাদ- সবই হাদীসে বিদ্যমান।

আরও বিদ্যমান- মুত্তাকী ও পাপীদের জন্য আল্লাহ তা'আলা জান্নাত ও জাহান্নামে কী কী নি'আমত ও শাস্তির ব্যবস্থা রেখেছেন। আসমান-যমীনে তিনি কি কি সৃষ্টি করেছেন।

তাতে রয়েছে পূর্ববর্তী নবীদের ঘটনাসমূহ, দুনিয়া বিমুখ আল্লাহর ওলীদের ঘটনাবলী, ফিকাহ শাস্ত্রবিদদের কথা, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ভাষণ ও তাঁর মুজিজাসমূহ। আরো রয়েছে পবিত্র কুরআনের তাফসীর, বিশেষ বিশেষ ঘটনাপঞ্জী, জ্ঞানগর্ভ আলোচনা এবং সাহাবায়ে কেরামের নানা বক্তব্য- যার মধ্যে অনেক শরঈ হুকুমের ব্যাখ্যা পাওয়া যায়। আল্লাহ তা'আলা রাসূলের হাদীসকে করেছেন শরী'আতের মূল ভিত্তি। এর মাধ্যমে নিকৃষ্ট বিদ'আদসমূহকে ধ্বংস করেছেন।

হাদীস পন্থীরা হচ্ছেন তাঁর সৃষ্টির মাঝে সবচেয়ে আমানতদার। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তাঁর উম্মতের মধ্যে যোগসূত্র। তাঁর হাদীস সমূহ সংরক্ষণকারী। তাদের জ্যোতি প্রকাশমান এবং সর্বক্ষেত্রেই তাদের ফযিলত বিরাজমান। আহলে রায় ও মতবাদ পূজারীদের উচিৎ

আত্ম-শুদ্ধির জন্য তাদের নিকট আসা এবং তাদের রাস্তা গ্রহণ করা। কারণ, তাদের অবলম্বন হচ্ছে আল্লাহর কিতাব ও নবীর সুন্নাত। তারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দলভূক্ত। তাঁর সাথেই তাদের সম্পর্ক। তারা অন্যের কথায় কর্ণপাত করে না। যারা তাদের সাথে শত্রুতা করে আল্লাহ তাদেরকে ধ্বংস করেন। আর যারা তাদের সাথে বিদ্বেষ পোষণ করে তাদেরকে তিনি অপমানিত করেন। হে আল্লাহ আমাদেরকে হাদীস অনুযায়ী চালিত কর। এর ওপর আমল করার তাওফীক দাও। তার ওপর যারা চলে তাদের ভালোবাসতে শিখাও ও তাদের সাহায্যকারী বানিয়ে দাও।

তাওহীদ ও তার শ্রেনিবিভাগ

তাওহিদ হচ্ছে এক আল্লাহর ইবাদত করা, যার জন্য তিনি এই সৃষ্টিজগত সৃজন করেছেন। আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

﴿وَمَا خَلَقْتُ ٱلْجِنَّ وَٱلْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ۝٥٦﴾ [الذاريات: ٥٦]

“নিশ্চয় আমি জিন্ন এবং মানুষকে সৃষ্টি করেছি একমাত্র আমার ইবাদত করার জন্য”। [সূরা আয-যারিয়াত, আয়াত: ৫৬]

অর্থাৎ কেবল আমারই ইবাদত করবে, আমারই নিকট দো‘আ করবে। যারা বলে দুনিয়া সৃষ্টি করা হয়েছে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কারণে, এই আয়াত তাদের দাবিকে বাতিল করে সুস্পষ্টরূপে।

তাওহীদ তিন ভাগে বিভক্ত

১। তাওহিদুর রুবুবিয়্যাহ:

আর তা হচ্ছে এ কথার স্বীকৃতি দেওয়া যে, আল্লাহই একমাত্র রব ও স্রষ্টা। অমুসলিম-কাফিররা তাওহীদের এ অংশকে স্বীকার করত। এতদসত্ত্বেও, তারা ইসলামে প্রবেশ করে নি।

আল্লাহ তাদের সম্বন্ধে বলেন,

﴿وَلَئِن سَأَلۡتَهُم مَّنۡ خَلَقَهُمۡ لَيَقُولُنَّ ٱللَّهُۖ ٨٧﴾ [الزخرف: ٨٧]

“যদি তাদেরকে প্রশ্ন কর, কে তাদের সৃষ্টি করেছে? তারা অবশ্যই বলবে- আল্লাহ”। [সূরা আয-যুখরুফ, আয়াত: ৮৭]

কিন্তু বর্তমান যুগের নাস্তিকরা আল্লাহর অস্তিত্বকে পর্যন্ত অস্বীকার করে। তারা জাহিলী যুগের কাফিরদের থেকেও শক্ত কাফির।

২। তাওহীদুল উলূহিয়্যাহ

আর তা হচ্ছে একমাত্র আল্লাহর ইবাদত করা। তাঁর ইবাদতে আর কাউকে শরীক না করা। শরী‘আত সম্মত ইবাদতের মধ্যে রয়েছে, দো‘আ, সাহায্য প্রার্থনা করা, তওয়াফ করা, যবেহ করা, নযর (মানত) দেওয়া ইত্যাদি। কাফিররা এ তাওহীদকে অস্বীকার করে। নূহ আলাইহিস সালাম থেকে শুরু করে শেষ নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পর্যন্ত সমস্ত আম্বিয়া আলাইহিমুস সালাম ও তাঁদের উম্মতের মধ্যে বিরোধ ও শত্রুতা চলেছে এ তাওহীদকে ঘিরেই। এসব ঘটনা পবিত্র কুরআনে বহু সূরায় আলোচিত হয়েছে।

পবিত্র কুরআনে এক আল্লাহর কাছে দো'আ করতে বলা হয়েছে । যেমন, সূরা ফাতিহাতে আমরা তিলাওয়াত করি:

﴿إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ ۝٥﴾ [الفاتحة: ٥]

"আমরা কেবল তোমারই ইবাদত করি, আর তোমারই নিকট সাহায্য চাই"। [সূরা আল-ফাতিহা, আয়াত ৫]।

অর্থাৎ তুমি ছাড়া অন্য কারও কাছে সাহায্য চাই না। এর মধ্যে অন্তর্ভূক্ত আছে তাঁর নিকট দো'আ করা, কুরআন অনুযায়ী বিচার করা, শরী'আত অনুযায়ী হুকুমাত গঠন করা। আর এ সবকিছুই আল্লাহর ঐ কথার অন্তর্ভূক্ত। যাতে তিনি বলেন,

﴿إِنَّنِيٓ أَنَا ٱللَّهُ لَآ إِلَٰهَ إِلَّآ أَنَا۠ فَٱعْبُدْنِي ۝١٤﴾ [طه: ١٤]

"অবশ্যই আমিই আল্লাহ, আমি ছাড়া সত্যিকার আর কোনো মা'বুদ নেই, তাই আমারই ইবাদত কর"। [সূরা ত্বাহা, আয়াত: ১৪]

৩। **তাওহীদুল আসমা ওয়াস সিফাত**

আর তা হচ্ছে, পবিত্র কুরআন ও সহীহ হাদীসে বর্ণিত আল্লাহর যাবতীয় গুণাবলির ওপর ঈমান আনা। যে সব গুণাবলীতে আল্লাহ তা'আলা নিজেকে ভূষিত করেছেন অথবা তাঁর নবী তাঁকে বিভূষিত করেছেন সে সব গুণাবলির ওপর তাবীল, তাকয়ীফ ও তা'তীল ব্যতীত ঈমান আনা। যেমন: 'ইসতাওয়া' এর অর্থ হলো বসা, নুযুল অর্থ অবতীর্ণ হওয়া। অনুরূপভাবে হুযূর অর্থ উপস্থিত হওয়া। এসব গুণাবলীর ব্যাখায় সাহাবীদের থেকে যা কিছু বর্ণিত হয়েছে তা সেভাবেই বিশ্বাস করা।

যেমন ‘ইসতাওয়া’ সম্বন্ধে সহীহ বুখারীদে তাবেঈনদের বর্ণনায় আছে, উর্ধ্বে উঠা ও আরোহণ করা। আমরা সেটি সেভাবেই বিশ্বাস করব যেভাবে তাঁর জন্য প্রযোজ্য ও সঙ্গতিপূর্ণ হয়।

﴿لَيۡسَ كَمِثۡلِهِۦ شَيۡءٞۖ وَهُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلۡبَصِيرُ ١١﴾ [الشورى: ١١]

“তাঁর মত কিছু নেই আর তিনি সর্বশ্রোতা ও সর্বদ্রষ্টা। [সূরা আশ=শুরা, আয়াত: ১১]

এর অর্থ হচ্ছে: আল্লাহ ছাড়া সত্যিকারের কোনো উপাস্য নেই। এর অন্তর্ভূক্ত হচ্ছে আল্লাহ ব্যতীত সকল উপাস্যকে অস্বীকার করা- ইবাদত শুধুমাত্র রাব্বুল আলামীনের ক্ষেত্রে স্বীকার করা।

১। তা‘বিল: কুরআনের সুস্পষ্ট আয়াত ও সহীহ হাদীসের বিপরীত কোনো আচরণ করাই হচ্ছে তা‘বিল। যেমন, ইসতোয়া (উর্ধ্বে আরোহণ, বসা) ইত্যাদির অর্থ ইসতাওলা বা শক্তি প্রয়োগে দখল করা বুঝায় না।

২। তা‘তীল: হচ্ছে আল্লাহর কোনো সিফাতকে (গুণ) অস্বীকার করা। যেমন আল্লাহ তা‘আলা আসমানের উপর আছেন। (এটি আল্লাহর একটি গুণ, আমরা এটি যেভাবে বর্ণিত হয়েছে কোনোরূপ ব্যাখ্যা ছাড়াই ঠিক সেভাবে বিশ্বাস করি। এর প্রকৃত অবস্থা সম্বন্ধে আল্লাহই ভালো জানেন।) কিন্তু আমাদের অনেকের ভ্রান্ত ধারণা আছে যে আল্লাহ তা‘আলা সর্বত্র বিরাজমান।

৩। তাকয়ীফ: হচ্ছে আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের কোনো গুণকে কোনো নির্দিষ্ট আকারে চিন্তা করা। যেমন, আল্লাহ তা‘আলা যে ‘আরশের উপর

আছেন তা তাঁর অন্য কোনো সৃষ্টির সাথে তুলনা করা। তিনি কীভাবে 'আরশের উপর আছেন তা তিনিই জানেন। অন্য কেউ তা জানে না।

৪। তামছীল: হচ্ছে আল্লাহ তা'আলার কোনো গুণকে তাঁর সৃষ্টির সাথে তুলনা করা। যেমন, আল্লাহ প্রতি রাত্রে প্রথম আসমানে অবতীর্ণ হন। কিন্তু তাঁর অবতীর্ণ হওয়া ও আমাদের কোনো জায়গায় অবতীর্ণ হওয়া এক নয়। অবতীর্ণ হওয়ার হাদীস সহীহ মুসলিমে বর্ণিত হয়েছে সহীহ সনদে। অনেকে মিথ্যা বলে যে, শাইখুল ইসলাম ইবন তাইমিয়া রহ. তার কিতাবে এই ধরণের তামছীল বা তুলনা করেছেন; কিন্তু সত্যিকার অর্থে তার কিতাব পাঠ করলে দেখা যাবে যে, তিনি তুলনা কিংবা উপমা এভাবে দেন নি।

৫। তাফবীয: সালাফে সালেহীনগণ আল্লাহর আকৃতির ব্যাপারে কোনো প্রসঙ্গ এলে তারা বলতেন: আমরা তাঁর আকৃতি জানি না, কিন্তু যে সব অঙ্গ সম্বন্ধে বলা হয়েছে তা বুঝি। যেমন ইসতোয়া অর্থ হচ্ছে উর্ধ্বে আরোহণ, কিন্তু কীভাবে উর্দ্ধে আরোহণ করেছেন তা আমরা জানি না।

৬। কিন্তু কিছু লোক আছে যারা আল্লাহ তা'আলার এ সমস্ত সিফাতকে স্বীকার করে ঠিক তবে অর্থ ও অবস্থান উভয়কেই অস্বীকার করে। তাদের এমন মন্তব্য উম্মে সালামাহ রাদিয়াল্লাহু 'আনহু ইমাম মালেকের রহ. উস্তাদ ইমাম রবীয়া রহ. এবং ইমাম মালেক রহ. প্রমুখ সালাফে সালেহীনের মতের পরিপন্থী। কারণ, তাদের মতে, ইসতোয়া (বসা বা উর্দ্ধারোহণ)-এর অর্থ সকলেই বুঝে, কিন্তু কীভাবে বা তার ধরণ কি?

সে বিষয়ে কেউ জানে না। এর ওপর ঈমান আনা ওয়াজিব,আর এর কাইফিয়াত (ধরণ) সম্বন্ধে প্রশ্ন করা বিদ‘আত।

৭। পবিত্র কালেমা (লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ) উচ্চারণকারীর পক্ষে উপকারী হিসাবে কার্যকর থাকে যতক্ষণ না সে কোনো শির্কের সাথে সংশ্লিষ্ট হয়। কালিমা পাঠকারীর দ্বারা কোনো শির্ক সংঘটিত হয়ে গেলে তা আর তার জন্য উপকারী থাকে না। ব্যাপারটি ঠিক ওযুর মত যা প্রশ্রাব, পায়খানা বা বায়ূ নির্গমণের কারণে অকার্যকর বা নষ্ট হয়ে যায়। তাই আল্লাহর জন্য নির্দিষ্ট কোনো ইবাদত অন্য কারো জন্য সম্পাদন করা হলে তা শির্ক বলে বিবেচিত হবে। যেমন, দো‘আ করা, যবেহ করা, মাজারে নযর-মানত দেওয়া ইত্যাদি।

মুহাম্মাদ রাসূলুল্লাহর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) অর্থ কী?

মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ-এর অর্থ হচ্ছে, এ বিশ্বাস পোষণ করা যে, তিনি আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের নিকট হতে প্রেরিত। ফলে, তিনি যা বলেছেন তা সত্য বলে স্বীকার করব, যে সব বিষয়ে নির্দেশ দিয়েছেন তা মেনে চলব এবং যে সব বিষয়ে নিষেধ করেছেন বা সতর্ক করেছেন তা হতে বিরত থাকব। কারণ, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কথা মান্য করা মূলতঃ আল্লাহকে মান্য করা।

১। শাইখ আবুল হাসান আলী নদভী রহ. তার নবুওয়াত গ্রন্থে বলেছেন, প্রত্যেক এলাকায় আগত সকল নবীর সর্বপ্রথম ও প্রধান দাওয়াত ছিল আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার ব্যাপারে আক্বীদা শুদ্ধ করা, বান্দা ও তার রবের মাঝে সম্বন্ধকে শুদ্ধ করা। ইখলাসের সাথে আল্লাহর দীনকে মেনে চলা এবং এক আল্লাহর ইবাদত করার প্রতি। কারণ, উপকার ও ক্ষতি তিনিই করেন। তিনিই ইবাদত পাওয়ার যোগ্যতা রাখেন। দোআ, বিপদে আশ্রয় প্রার্থনা ও জন্তু যবেহ করা সবই তাঁর জন্যই। নবীগণ প্রত্যেকেই তাদের যুগে প্রচলিত এক আল্লাহর ইবাদত পরিপন্থী যাবতীয় পুজা-উপসনা-প্রথার বিরুদ্ধে দুর্বার আন্দেলন করেছেন। যেমন, মূর্তি ও পাথরের পূজা, জীবিত কিংবা মৃত নেক লোকদের পূজা ইত্যাদি। ২। আল্লাহ তা'আলা আমাদের রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সম্বন্ধে বলেন,

﴿قُل لَّآ أَمۡلِكُ لِنَفۡسِي نَفۡعٗا وَلَا ضَرًّا إِلَّا مَا شَآءَ ٱللَّهُۚ وَلَوۡ كُنتُ أَعۡلَمُ ٱلۡغَيۡبَ لَٱسۡتَكۡثَرۡتُ مِنَ ٱلۡخَيۡرِ وَمَا مَسَّنِيَ ٱلسُّوٓءُۚ إِنۡ أَنَا۠ إِلَّا نَذِيرٞ وَبَشِيرٞ لِّقَوۡمٖ يُؤۡمِنُونَ ١٨٨﴾ [الاعراف: ١٨٧]

“বল, ‘আমি আমার নিজের কোনো উপকার ও ক্ষতির ক্ষমতা রাখি না, তবে আল্লাহ যা চান। আর আমি যদি গায়েব জানতাম তাহলে অধিক কল্যাণ লাভ করতাম এবং আমাকে কোন ক্ষতি স্পর্শ করত না। আমিতো একজন সতর্ককারী ও সুসংবাদদাতা এমন কওমের জন্য, যারা বিশ্বাস করে”। [সূরা আ‘রাফ, আয়াত: ১৮৭]

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

«لاَ تُطْرُونِي، كَمَا أَطْرَتْ النَّصَارَى ابْنَ مَرْيَمَ، فَإِنَّمَا أَنَا عَبْدُهُ، فَقُولُوا عَبْدُ اللَّهِ، وَرَسُولُهُ»

“আমার (প্রশংসার) ব্যাপারে তোমরা সীমালংঘন কর না যেমন, খৃষ্টানরা ঈসা ইবন মারইয়াম সম্বন্ধে সীমালংঘন করেছে। আমার একমাত্র পরিচয় আমি বান্দা। তাই বল, আল্লাহর বান্দা এবং তার রাসূল”।[15]

ইতরা শব্দের অর্থ হচ্ছে বাড়ান ও প্রশংসার ক্ষেত্রে সীমা লংঘন করা। আমরা আল্লাহকে ছেড়ে তাঁকে ডাকব না যেমনটি করেছে খৃষ্টানরা, যার ফলে তারা শির্কে পতিত হয়েছে।

৩। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে মহব্বত করার প্রকৃতরূপ হলো, তার হুকুম মেনে চলার জন্য আল্লাহর কাছে দো‘আ

---

[15] সহীহ বুখারী, হাদীস নং ৩৪৪৫।

করা এবং তাঁকে ছেড়ে অন্যের কাছে দো‘আ না করা, যদিও সে কোনো রাসূল হোক কিংবা কোনো ওলী।

আল্লাহর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

«إذا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللهَ وَاذا اسْتَعَنْتَ فاسْتَعِنْ باللهِ»

“যখন (কিছু) চাইবে আল্লাহর কাছেই চাইবে আর যখন সাহায্য প্রার্থনা করবে আল্লাহর কাছেই প্রার্থনা করবে”।[16]

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওপর কোনো দুঃখ কিংবা পেরেশানী আসলে বলতেন,

«يَا حَيُّ يَا قَيُّومُ بِرَحْمَتِكَ أَسْتَغِيثُ».

“হে চিরঞ্জীব! হে চিরস্থায়ী, তোমার দয়ার দ্বারা বিপদ উদ্ধার চাচ্ছি।[17]

﴿إِيَّاكَ نَعۡبُدُ وَإِيَّاكَ نَسۡتَعِينُ ۝٥﴾ [الفاتحة: ٥]

“আমরা কেবল তোমারই ইবাদত করি, আর তোমারই নিকট সাহায্য চাই”। [সূরা আল-ফাতিহা, আয়াত: ৫]

হে আল্লাহ! তোমাকে ছাড়া আমরা অন্য কারও ইবাদত করি না, কারও নিকট দো‘আ করি না এবং কারও কাছে সাহায্যও চাই না।

---

[16] তিরমিযী, হাদীস নং ২৫১৬, তিনি হাদীসটিকে হাসান সহীহ বলেছেন। আলবানী রহ. হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন।

[17] তিরমিযী, হাদীস নং ৩৫২৪, তিনি হাদীসটিকে গরীব বলেছেন।

১। ভাষাবিদরা বলেছেন, مفعول به কে আগে আনা হয়েছে حصر ও تخصيص এর জন্য অর্থাৎ ইবাদত ও সাহায্য একমাত্র আল্লাহ হতে- তিনি ব্যতীত এগুলোতে কারও হাত নেই।

২। এ আয়াতটি প্রতিটি মুসলিম প্রতি দিন সালাত ও সালাতের বাইরে বার বার পাঠ করে। এটি সূরা ফাতিহার মূল। আর সূরা ফাতিহা সমস্ত কুরআনের মূল।

৩। ইবাদত বলতে এই আয়াতে সকল প্রকার ইবাদতকে বুঝান হয়েছে। যেমন: সালাত, মানত, যবেহ্ আর দো'আর তো কোনো কথাই নেই। কারণ, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

«الدُّعَاءُ هُوَ العِبَادَةُ»

"দো'আ-ই ইবাদত"।[18]

সালাত একটি গুরুত্বপূর্ণ ইবাদত। তাই এটি কোনো রাসূল কিংবা ওলীর উদ্দেশে আদায় করা জায়েয নয়। তেমনি দো'আও। কারণ, সেটিও ইবাদত। একমাত্র আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের জন্য খাস।

আল্লাহ বলেন,

﴿قُلۡ إِنَّمَآ أَدۡعُواْ رَبِّي وَلَآ أُشۡرِكُ بِهِۦٓ أَحَدٗا ٢٠﴾ [الجن: ٢٠]

[18] তিরমিযী, হাদীস নং ২৯৬৯, তিনি হাদীসটিকে হাসান সহীহ বলেছেন।

“বল, ‘নিশ্চয় আমি আমার রবকে ডাকি এবং তার সাথে কাউকে শরীক করি না”। [সূরা আল-জিন্ন, আয়াত: ২০]

৪। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

«دَعْوَةُ ذِي النُّونِ إِذْ دَعَا وَهُوَ فِي بَطْنِ الْحُوتِ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ، إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ، إِنَّهُ لَمْ يَدْعُ بِهَا مُسْلِمٌ فِي شَيْءٍ قَطُّ إِلَّا اسْتَجَابَ اللَّهُ لَهُ بِهَا»

“ইউনুস ‘আলাইহিস সালামের দো‘আ, যা তিনি মাছের পেটে বসে করেছিলেন: তুমি ছাড়া সত্যিকার কোনো মা‘বুদ নেই। হে আল্লাহ! আমি তোমার পবিত্রতা ঘোষণা করছি। নিশ্চয় আমি যালিমদের অন্তর্ভূক্ত। এই দো‘আ যে কোনো মুসলিমই যে কোনো ব্যাপারে করুক না কেন অবশ্যই আল্লাহ তার দো‘আকে কবুল করবেন”।[19]

৫। আল্লাহ তা‘আলার ইবাদত একমাত্র তাঁর জন্যই হবে এবং তাঁর নিকট দো‘আর মাধ্যমে হে আল্লাহ! আমি চাই তুমি আমার দুঃখ দুর কর! কারণ, দুঃখ কষ্ট আল্লাহ ছাড়া আর কেউ দূর করতে পারে না।

---

[19] মুসতাদরাক লিল হাকেম, হাদীস নং ১৮৬২, তিনি হাদীসটিকে সহীহুল ইসনাদ বলেছেন, যাহাবী রহ. সহীহ হাদীসটিকে বলেছেন। তিরমিজি, হাদীস নং ৩৫০৫।

একমাত্র আল্লাহর কাছে সাহায্য চাও

আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

«إذا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللهَ وَاذا اسْتَعَنْتَ فاسْتَعِنْ باللهِ»

"যখন (কিছু) চাইবে আল্লাহর কাছেই চাইবে আর যখন সাহায্য প্রার্থনা করবে আল্লাহর কাছেই প্রার্থনা করবে"।[20]

১। ইমাম নাওয়াওয়ী ও আল্লামা হাইছামী রহ. এ হাদীসের ব্যাখ্যায় বলেছেন, যখন দুনিয়া বা আখিরাতের কোনো কাজে সাহায্য চাও তখন একমাত্র আল্লাহর কাছেই চাও। বিশেষ করে সেসব কাজে যা আল্লাহ ছাড়া অন্য কেউ করতে পারে না। যেমন, রোগমুক্তি, রিযক ও হিদায়াত দান। এগুলো কেবল আল্লাহ তালাই পারেন অন্য কেউ নয়।

আল্লাহ বলেন,

﴿وَإِن يَمۡسَسۡكَ ٱللَّهُ بِضُرّٖ فَلَا كَاشِفَ لَهُۥٓ إِلَّا هُوَۖ ١٧﴾ [الانعام: ١٧]

"আর যদি আল্লাহ তোমাকে কোনো দুর্দশা দ্বারা স্পর্শ করেন, তবে তিনি ছাড়া তা দূরকারী কেউ নেই"। [সূরা আল-আন'আম, আয়াত: ১৭]

২। তবে হ্যাঁ, জীবিতদের নিকট সেসব কাজে সাহায্য চাওয়া যায় যা তাদের সামর্থের মধ্যে। যেমন, মসজিদ নির্মাণ বা এ জাতীয় অন্য কোনো কাজ সম্পন্ন করতে সাহায্য চাওয়া।

---

20 তিরমিযী, হাদীস নং ২৫১৬, তিনি হাদীসটিকে হাসান সহীহ বলেছেন। আলবানী রহ. হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন।

এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

﴿وَتَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلۡبِرِّ وَٱلتَّقۡوَىٰۖ وَلَا تَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلۡإِثۡمِ وَٱلۡعُدۡوَٰنِۚ ۝٢﴾ [المائدة: ٢]

“সৎকর্ম ও তাকওয়ায় তোমরা পরস্পরের সহযোগিতা কর। মন্দকর্ম ও সীমালঙ্ঘনে পরস্পরের সহযোগিতা করো না”। [সূরা আল-মায়েদা, আয়াত: ২]

যে ব্যক্তি (চলার জন্য) দলীল-প্রমাণ চায় পবিত্র কুরআনই তার জন্য যথেষ্ট। আর কেউ উদ্ধারকারী অনুসন্ধান করলে আল্লাহই তার জন্য যথেষ্ট। ভীতি প্রদর্শনকারী চাইলে মৃত্যুই তার জন্য যথেষ্ট। আর এগুলোর কোনোটাই যার জন্য যথেষ্ট নয়, তার জন্য জাহান্নামই যথেষ্ট। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা‘আলা বলেন,

﴿أَلَيۡسَ ٱللَّهُ بِكَافٍ عَبۡدَهُۥۖ ۝٣٦﴾ [الزمر: ٣٥]

“আল্লাহ কি তাঁর বান্দার জন্য যথেষ্ট নন?” [সূরা আয-যুমার, আয়াত: ৩৬]

৩। শাইখ আব্দুল কাদের জিলানী রহ. আল-ফাতহুর রব্বানী গ্রন্থে বলেছেন, কেবল আল্লাহর কাছে সাহায্য চাও, অন্য কারো কাছে নয়। ধিক তোমাকে, কোন মুখে দেখা করবে তুমি আল্লাহর সাথে কিয়ামত দিবসে? তাঁর সাথে তুমি ক্ষণস্থায়ী এ দুনিয়ায় বিবাদ করেছ। তাঁর থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছ। তাঁর সাথে শির্ক করে সৃষ্টির দিকে মুখ করেছ। তাদের মুখাপেক্ষী হয়েছ। তাদের মাধ্যমে প্রয়োজনীয় জিনিস যাঞ্ছা করেছ। তাদের ওপর ভরসা করেছ। তাদেরকে তোমার ও আল্লাহর

মধ্যে সংযোগকারী স্থির করেছ। তাদের সাথে থাকা তোমার জন্য ফিৎনা। তাদের কাছে কিছুই নেই; না রাজত্ব, না ক্ষমতা, না দৌলত, না সম্মান। এগুলো আছে একমাত্র আল্লাহর কাছে। তিনি ভিন্ন কারো কাছে এসব কিছুই নেই। তাই প্রতিটি মুহূর্ত আল্লাহ তা'আলার সাথে থাকতে চেষ্টা কর। বান্দার কথার প্রতি দৃষ্টি দিও না।

৪। যে সব সাহায্য প্রার্থনা শরী'আত অনুমোদন করে:

যেমন কষ্ট-অসুবিধা দূর করার জন্য আল্লাহর নিকট সাহায্য প্রার্থনা করা। যে কোনো বিষয়ে তার দারস্থ হওয়া ইত্যাদি...

আর যে সব সাহায্য প্রার্থনা শির্কের পর্যায়ভূক্ত:

যেমন, আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো নিকট এমন বিষয়ে সাহায্য প্রার্থনা করা যার ওপর তিনি ব্যতীত আর কারো ক্ষমতা নেই। যথা প্রয়াত আম্বিয়া ও আওলিয়াদের নিকট সাহায্য চাওয়া। অনুপস্থিত জীবিত ব্যক্তির নিকট সাহায্য চাওয়া। এরূপ সাহায্য প্রার্থনা শির্ক। কারণ, যাদের কাছে সাহায্য প্রার্থনা করা হলো, তাদের হাতে না আছে উপকার করার ক্ষমতা, আর না আছে ক্ষতি করার সামর্থ। এসব আহ্বান ও দো'আ তারা শুনতেই পায় না। যদি শুনতে পেতও উত্তর দিতে পারত না। মহান আল্লাহ এসব বিষয় পবিত্র কুরআনে পরিষ্কারভাবে বর্ণনা করেছেন।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

«وَاللهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ»

“আল্লাহ বান্দার সাহায্য করতে থাকেন যতক্ষণ সে তার কোনো ভাইয়ের সাহায্যে নিয়োজিত থাকে”।[21]

আল্লাহ ‘আরশের উপর আছেন:

আল্লাহ রাব্বুল আলামীন ‘আরশের ওপর আছেন। এ বিষয়টি পবিত্র কুরআনের বহু আয়াত, অসংখ্য সহীহ হাদীস এবং সালাফে সালেহীনদের কথা হতে প্রমাণিত।

১। আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

﴿إِلَيۡهِ يَصۡعَدُ ٱلۡكَلِمُ ٱلطَّيِّبُ وَٱلۡعَمَلُ ٱلصَّٰلِحُ يَرۡفَعُهُۥ ۝١٠﴾ [فاطر: ١٠]

“তাঁরই পানে উত্থিত হয় ভালো কথা (কালেমা তাইয়েবা) আর নেক আমল তা উন্নীত করে”। [সূরা ফাতির, আয়াত: ১০]

২। অন্যত্র বলেন,

﴿مِّنَ ٱللَّهِ ذِي ٱلۡمَعَارِجِ ۝٣ تَعۡرُجُ ٱلۡمَلَٰٓئِكَةُ وَٱلرُّوحُ إِلَيۡهِ ۝٤﴾ [المعارج: ٣، ٤]

“ঊর্ধ্বারোহণের সোপানসমূহের অধিকারী, ফিরিশতাগণ ও রূহ আল্লাহর পানে ঊর্ধ্বগামী হয়”। [সূরা আল-মা‘আরিজ, আয়াত: ৩-৪]

৩। আল্লাহ তা‘আলা আরও বলেন:

﴿سَبِّحِ ٱسۡمَ رَبِّكَ ٱلۡأَعۡلَى ۝١﴾ [الاعلى: ١]

[21] সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ২৬৯৯।

“তুমি তোমার সুমহান রবের নামের তাসবীহ পাঠ কর”। [সূরা আল-আ‘লা, আয়াত: ১]

৪। অন্যত্র তিনি বলেন,

﴿ٱلرَّحۡمَٰنُ عَلَى ٱلۡعَرۡشِ ٱسۡتَوَىٰ ۝٥﴾ [طه: ٥]

“রহমান-পরম করুণাময়, ‘আরশের ওপর উঠেছেন”। [সূরা ত্বাহা, আয়াত: ৫]

৫। ইমাম বুখারী রহ. ‘এসতোয়া’ শব্দের অর্থ করেছেন, উর্ধ্বারোহণ ও উপরে অধিষ্ঠিত হওয়া।

৬। বিদায় হজে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খুতবায় উচ্চারণ করেছিলেন:

«ألا هَلْ بَلَّغْتُ؟ قَالُوا نَعَمْ يَرْفَعُ أُصْبَعَهُ إلى السَّمَاءِ وَيَنْكُبُهَا إلَيْهِمْ وَيَقُوْلُ: اَللّٰهُمَّ اشْهَدْ»

“হে উপস্থিতি! আমি কি পৌঁছেয়েছি? সাহাবীগণ রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু বললেন: হ্যাঁ, অবশ্যই। তখন তিনি আসমানের দিকে তর্জনী উঠিয়ে সাহাবীদের দিকে ইশারা করে বললেন: হে আল্লাহ! তুমি সাক্ষী থেক”।[22]

---

[22] সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ১২১৮। তবে বর্ণনার সিগাহ এভাবে:
فَقَالَ: بِإِصْبَعِهِ السَّبَّابَةِ، يَرْفَعُهَا إِلَى السَّمَاءِ وَيَنْكُتُهَا إِلَى النَّاسِ «اللهُمَّ، اشْهَدْ، اللهُمَّ، اشْهَدْ» ثَلَاثَ مَرَّاتٍ

৭। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

«لَمَّا قَضَى اللَّهُ الخَلْقَ كَتَبَ فِي كِتَابِهِ فَهُوَ عِنْدَهُ فَوْقَ العَرْشِ إِنَّ رَحْمَتِي غَلَبَتْ غَضَبِي»

“আল্লাহ তা‘আলা সৃষ্টিজগত সৃষ্টি করে তার কিতাবে লিখেছেন, আমার রহমত আমার গোস্বার ওপর বিজয়ী। সে কিতাবটি তাঁর নিকট ‘আরশের উপর আছে”।[23]

৮। অন্যত্র বলেছেন,

তোমরা কি আমাকে বিশ্বাস কর না! যিনি আসমানে আছেন তাঁর নিকট আমি বিশ্বাসী বলে পরিগণিত। সকাল-সন্ধ্যা আসমানের খবর আমার নিকট আসে। (সহীহ বুখারী ও মুসলিম)

৯। ইমাম আওযায়ী রহ. বলেছেন,

আমরা ও আমাদের সময়ের তাবেঈনরা বলতাম: নিশ্চয় মহান আল্লাহ ‘আরশের ওপর আছেন। আমরা হাদীসে বর্ণিত তাঁর সিফাতসমূহের ওপর ঈমান এনেছি। (বায়হাকী, সহীহ)।

১০। ইমাম শাফেঈ রহ. বলেছেন, আল্লাহ আসমানের উপর ‘আরশে আছেন। সেখান থেকে চাহিদা মাফিক সৃষ্টির নিকটবর্তী হন এবং প্রতি রাতের শেষ তৃতীয়াংশে দুনিয়ার আসমানে অবতীর্ণ হন যেভাবে চান সেভাবে।

---

[23] সহীহ বুখারী, হাদীস নং ৩১৯৪, সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ২৭৫১।

১১। ইমাম আবু হানিফা রহ. বলেছেন, যে বলল, আল্লাহ আসমানে না যমীনে, সে কুফুরী করল। কারণ, আল্লাহ নিজেই বলেছেন, তিনি ‘আরশের ওপর আছেন। তাঁর ‘আরশ সাত আসমানেরও উপরে। তিনি বলেন, যদি কেউ বলে, হ্যাঁ সত্যিই তিনি ‘আরশের উপর আছেন; কিন্তু ‘আরশ আসমানে না যমীনে তা জানি না, তাহলে সেও কাফির। কারণ, তিনি যে আসমানে আছেন সে ব্যক্তি তা অস্বীকার করেছে। আর আসমানে তাঁর বিদ্যমানতাকে যে ব্যক্তি অস্বীকার করে সে কুফুরী করল। কারণ, আল্লাহ ইল্লিয়িনে আছেন। তাছাড়া তাঁকে আমরা উপরের দিকে হাত তুলে ডাকি, নিচের দিকে নয়। (শরহুল আক্বীদাহ আত-তহাবিয়াহ)।

১২। যে ব্যক্তি ইসতাওয়াকে ইসতাওলা বলে ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করে সে যেন কুরআনের শব্দকে বিকৃত করল। কারণ, সালাফে সালেহীনদের কেউ একথা বলেন নি। তাদের রাস্তাই হচ্ছে সর্বোত্তম গ্রহণযোগ্য রাস্তা। আর ইসতাওলা শব্দের ব্যাখ্যা করলে অর্থ দাড়ায়, ‘আরশ আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের দখলে ছিল না, তিনি জোর করে দখল করেছেন।

তাওহীদের প্রয়োজনীয়তা

১। মহান আল্লাহ এ বিশ্ব চরাচরের সব কিছু সৃষ্টি করেছেন তাঁর ইবাদতের জন্য । তিনি অসংখ্য নবী-রাসূলদের পাঠিয়েছেন, লোকদের একত্ববাদের দিকে ডাকার জন্য। কুরআনের প্রায় সূরাতেই তাওহীদের প্রতি স্ববিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। শির্কের বর্ণনাও এসেছে অবধারিতভাবে। তাতে ব্যক্তি ও সমাজের ওপর শির্কের ক্ষতিকর দিকটি

ফুঠে উঠেছে সুন্দরভাবে। শির্ক একটি মারাত্মক পাপ, তার কারণেই মূলতঃ মানুষ দুনিয়াতে ধ্বংস হয় এবং আখেরাতে চিরকালের জন্য জাহান্নামে প্রবেশ করবে।

২। পৃথিবীতে আগত সকল রাসূলই সর্বপ্রথম আল্লাহর একত্ববাদের দিকে নিজ নিজ উম্মতদের দাওয়াত দিয়েছেন। কারণ, মহান আল্লাহ তাদের এ হুকুমই দিয়েছেন।

তিনি বলেন,

﴿وَمَآ أَرۡسَلۡنَا مِن قَبۡلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِيٓ إِلَيۡهِ أَنَّهُۥ لَآ إِلَٰهَ إِلَّآ أَنَا۠ فَٱعۡبُدُونِ ۝٢٥﴾ [الانبياء: ٢٥]

“আর তোমার পূর্বে এমন কোনো রাসূল আমি পাঠাইনি যার প্রতি এ ওহী নাযিল করিনি যে, আমি ছাড়া কোনো ইলাহ নেই; সুতরাং তোমরা আমারই ইবাদত কর”। [সূরা আম্বিয়া, আয়াত: ২৫]।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নবুওয়াতের পর মক্কা নগরীতে তের বছর অবস্থান করেছেন। তিনি তাঁর কাওমকে আল্লাহর একত্ববাদের প্রতি দাওয়াত দিয়েছেন এবং একমাত্র তাঁর কাছেই প্রার্থনা করার শিক্ষা দিয়েছেন।

এ সম্বন্ধে আল্লাহ বলেন,

﴿قُلۡ إِنَّمَآ أَدۡعُواْ رَبِّي وَلَآ أُشۡرِكُ بِهِۦٓ أَحَدٗا ۝٢٠﴾ [الجن: ٢٠]

“বল, আমি কেবল আমার রবকে ডাকি আর তাঁর সাথে অন্য কাউকে শরীক করি না”। [সূরা আল-জিন্ন, আয়াত: ২০]

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজ সহচর ও অনুসারীদেরকে প্রথম হতেই তাওহীদের ওপর গড়ে তুলেছেন। অল্প বয়স্ক-কিশোর চাচাতো ভাই আব্দুল্লাহ ইবন আব্বাস রাদিয়াল্লাহু 'আনহুকে এ বলে শিক্ষা দিয়েছেন:

«إذا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللهَ وَاذا اسْتَعَنْتَ فاسْتَعِنْ بِاللهِ»

"যখন (কিছু) চাইবে আল্লাহর কাছেই চাইবে আর যখন সাহায্য প্রার্থনা করবে আল্লাহর কাছেই প্রার্থনা করবে"।[24]

এ তাওহীদই হচ্ছে ইসলামের মূল ভিত্তি যার ওপর ইসলাম প্রতিষ্ঠিত। তাওহীদ ছাড়া আল্লাহ বান্দার আমল-ইবাদত কোনো কিছুই গ্রহণ করবেন না।

৩। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রিয় সাহাবীদের সর্বপ্রথম মানব জাতিকে তাওহীদের দিকে দাওয়াত দেওয়ার শিক্ষাই দিয়েছেন। এ দিকটিকেই তিনি সর্বাধিক গুরুত্ব দিয়েছেন। তাইতো আমরা দেখতে পাই মু'আজ রাদিয়াল্লাহু 'আনহুকে ইয়ামেনে পাঠানোর সময় তাঁর উপদেশ ছিল,

«فَلْيَكُنْ أَوَّلَ مَا تَدْعُوْهُمْ إِلَيْهِ شَهَادَةُ أن لا إلهَ إلاَّ اللهُ وَفِيْ رِوَايَةٍ إلى أنْ يُّوَحِدُوا اللهَ».

[24] তিরমিযী, হাদীস নং ২৫১৬, তিনি হাদীসটিকে হাসান সহীহ বলেছেন। আলবানী রহ. হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন।

“তাদের প্রতি তোমার দাওয়াতের সর্ব প্রথম বিষয় যেন হয় লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ মর্মে সাক্ষ্য দানের আহ্বান। অন্য একটি বর্ণনায় আছে, আল্লাহকে এক বলে মান্য করার প্রতি আহ্বান”।[25]

৪। তাওহীদের বহি:প্রকাশ কালেমা তাইয়্যেবার সাক্ষ্য দানের মাধ্যমে সম্পন্ন হয়। অর্থাৎ আল্লাহ ছাড়া কোনো মা‘বুদ নেই এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে নীতি ও বিধান নিয়ে আগমন করেছেন সে নীতি-বিধানের অনুবর্তিতায় যাবতীয় ইবাদত সম্পাদন করতে হবে মর্মে প্রত্যয় ব্যক্ত করে ঘোষণা দেওয়ার মাধ্যমেই মূলতঃ বুঝা যায় তার মাঝে তাওহীদ বিদ্যমান। এ সাক্ষ্য দানের মাধ্যমেই অমুসলিমদের ইসলামে প্রবেশ করতে হয়। এ সাক্ষ্য দান ব্যতীত ইসলামে প্রবেশের আর কোনো পথ নেই। এটি হচ্ছে জান্নাতের চাবি। এ কারণেই কালেমা ওয়ালা জান্নাতে প্রবেশ করবে। তবে শর্ত হচ্ছে, তাওহীদ ইবনষ্টকারী কোনো শির্কী কাজে জড়ানো যাবে না কিংবা কোনো কুফুরী বাক্য উচ্চারণ করা যাবে না।

৫। মক্কার কুরাইশরা মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সম্মুখে রাজত্ব, টাকা-পয়সা, বিয়ে ও অন্যান্য পার্থিব ভোগ সামগ্রীর লোভনীয় প্রস্তাব পেশ করে তাকেঁ প্রলুব্ধ করার প্রয়াস চালিয়েছিল। তারা চেয়েছিল তিনি যেন তাওহীদ ও আল্লাহর একত্ববাদের দাওয়াত বন্ধ করে দেন এবং মূর্তি পূজার বিরুদ্ধে কোনো কথা না বলেন। কিন্তু তিনি তাতে সম্মত হন নি, নিজ লক্ষ্য হতে পিছপা হন নি বিন্দু পরিমাণও,

---

[25] সহীহ বুখারী, হাদীস নং ১৪৫৮, সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ১৯।

বরং সাহাবীদের সাথে নিয়ে সর্ব প্রকার কষ্ট-যাতনা, নির্যাতন-নিপীড়ন সহ্য করে দাওয়াতি মিশন নিয়ে অগ্রসর হতে থাকেন। লক্ষ্য একটাই তাওহীদের জয় হতে হবে, না হয় এ মিশন চলবে আমৃত্যু। তের বছর নিরবচ্ছিন্ন চেষ্টা-শ্রমের পর তাঁর সংগ্রাম সফল হয়, সাধনা পূর্ণতা লাভ করে, মিশন জয়ী হয়। আর মক্কা হয় বিজিত, ভাঙ্গা হয় সংরক্ষিত মূর্তিদের। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তখন বলেছিলেন:

﴿وَقُلۡ جَآءَ ٱلۡحَقُّ وَزَهَقَ ٱلۡبَٰطِلُۚ إِنَّ ٱلۡبَٰطِلَ كَانَ زَهُوقٗا ٨١﴾ [الاسراء: ٨١]

"হক এসেছে এবং বাতিল বিলুপ্ত হয়েছে। নিশ্চয় বাতিল বিলুপ্ত হওয়ারই ছিল"। [সূরা আল-ইসরা, আয়াত: ৮১]

৬। তাওহীদ হচ্ছে প্রত্যেক মুসলিমের জীবনের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। তাই জীবন শুরু করতে হবে তাওহীদ দিয়ে, শেষও করতে হবে তাওহীদ দিয়েই। জীবনের প্রতিটি পর্বে, প্রতিটি অনুষঙ্গে তাওহীদকে প্রতিষ্ঠা করা, তাওহীদের প্রতি অপরকে দাওয়াত দেওয়াই হচ্ছে তার কাজ। কারণ, কেবল তাওহীদই পারে মুমিনদেরকে ঐক্যবদ্ধ করতে, দাড় করাতে পারে তাদেরকে কালেমার ওপর একতাবদ্ধভাবে।

মহান আল্লাহর নিকট বিনীত প্রার্থনা, তিনি যেন তাওহীদের কালেমাকেই আমাদের শেষ কথা বানান এবং সকল মুমিন-মুসলিমদের তাওহীদের ওপর একত্র করেন। আমীন।

তাওহীদের উপকারিতা

মানুষের একক ও সমষ্টিগত জীবনে সত্যিকারের তাওহীদ প্রতিষ্ঠিত হলে মানুষ লাভবান হবে দারুনভাবে, অতীব সুন্দর ফল পাবে সার্বিক ক্ষেত্রে। কিছু কিছু লাভের কথা নিম্নে আলোচনা করা হলো,

১। তাওহীদ তার অনুসারীকে সৃষ্টির দাসত্ব থেকে মুক্ত করে আনে। আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারো কাছে নত হওয়া থেকে রক্ষা করে। সৃষ্টি যারা কিছুই সৃষ্টি করতে পারে না বরং তাদেরকেই সৃষ্টি করা হয়েছে। যাদের কোনো ক্ষমতা নেই। যারা নিজেদের ভালো-মন্দ, কল্যাণ-অকল্যাণ কিছুই করতে পারে না। না তারা মৃত্যু দেওয়ার ক্ষমতা রাখে, না মৃত্যু থেকে বাঁচানোর। তাওহীদ মানুষকে সে সব অথর্ব সৃষ্টির ইবাদত হতে মুক্তি দেয়। তাদের গোলামী থেকে বাঁচিয়ে এক আল্লাহর দাসত্বে লাগিয়ে দেয়। যিনি তার রব ও স্রষ্টা। তার বিবেক-বুদ্ধিকে নানা কুসংস্কার ও মিথ্যা ধারণা থেকে স্বাধীন করে। অন্যের নিকট নত ও অপমানিত হওয়া থেকে মুক্তি দেয়। তার জীবনকে ফিরআউন জাতীয় অত্যাচারীদের হাত হতে রক্ষা করে। বিভিন্ন নেতা, জিন ও মূর্তি পূজারীর কবল হতে স্বাধীন করে আনে। তাইতো পবিত্র কুরআন অধ্যয়ন করলে দেখা যায়, মুশরিক নেতৃবৃন্দ ও অজ্ঞ সীমালংঘনকারীরা সর্বদাই নবীদের দাওয়াতের বিরোধিতা করেছে। বিশেষতঃ আমাদের রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দাওয়াতের। কারন, তারা ভালোভাবেই বুঝত, মানুষ লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ উচ্চারণ করার সাথে সাথেই অন্য মানুষের গোলামী হতে স্বাধীন হয়ে যাবে। অত্যাচারের বেড়া

জাল ছিন্ন করে বাইরে বেরিয়ে আসবে। তাদের কপাল উচুঁ হবে এবং বিশ্ব জগতের রব এক আল্লাহ ছাড়া কারও কাছে মাথা নত করবে না।

২। তাওহীদ সঠিক ব্যক্তিত্ব গড়ে তুলতে সহায়তা করে। মানুষ এতে সঠিকভাবে জীবন গঠন করতে পারে এবং সত্যিকারের দিক নির্দেশনা পায়। তার লক্ষ্যবস্তুকে নির্দিষ্ট করে দেয়। কারণ, সে বুঝতে পারে এক আল্লাহ ছাড়া তার আর কোনো উপায় নেই। ফলে, তার দিকে গোপনে ও প্রকাশ্যে মুখ ফিরাতে পারে। সুখে ও দুঃখে তাঁকে ডাকতে পারে। অন্যদিকে মুশরিকদের অন্তর নানা ধরনের প্রভূ ও উপাস্যের প্রতি বিক্ষিপ্ত অবস্থায় থাকে। ফলে, একবার সে জীবিতদের দিকে মুখ ঘুরায়, আবার মৃতদের দিকে। এ কারণেই ইউসুফ 'আলাইহিস সালাম বলেছেন,

﴿يَٰصَٰحِبَيِ ٱلسِّجۡنِ ءَأَرۡبَابٞ مُّتَفَرِّقُونَ خَيۡرٌ أَمِ ٱللَّهُ ٱلۡوَٰحِدُ ٱلۡقَهَّارُ ٣٩﴾ [يوسف: ٣٩]

"হে আমার জেলের সাথীদ্বয়, বহু সংখ্যক ভিন্ন ভিন্ন রব ভালো নাকি মহাপরাক্রমশালী এক আল্লাহ?" [সূরা ইউসুফ, আয়াত: ৩৯]

তাই মুমিন ব্যক্তি এক আল্লাহর ইবাদত করে। সে জানে তার রব কি করলে খুশি হবেন, আর কি করলে নারাজ হবেন। তাই যে কাজে রব খুশি হন সে কাজ করতে থাকে, যে কাজে অসন্তুষ্ট হন তা হতে বিরত থাকে। ফলে তার অন্তর প্রশান্ত হয়ে যায়। আর মুশরিক ব্যক্তি নানা উপাস্যের উপাসনা করে। কোনোটা তাকে ডানে নিয়ে যায়, কোনোটা

নিয়ে যায় বামে। আর এ টানা পড়নে পড়ে সে হয় যায় কিংকর্তব্যবিমুঢ়। এতে করে তার মনে আর কোনো শান্তি থাকে না।

৩। তাওহীদ হচ্ছে মানুষের জীবনের নিরাপত্তার ভিত্তি। কারণ, এর দ্বারাই সে নিরাপত্তা ও শান্তি পায়। আল্লাহ ছাড়া কাউকে ভয় করে না। তাওহীদ শঙ্কা-ভয়ের সমস্ত দার বন্ধ করে দেয়। যেমন রিযকের ভয়, জীবন ও মৃত্যুর ভয়, আত্মীয়-পরিজনের জীবনের আশঙ্কা, মানুষের ভয়, জিন-ভূতের ভয় ইত্যাদি। একত্ববাদে বিশ্বাসী মুমিন আল্লাহ ছাড়া অন্য কাউকেই ভয় করে না। অন্যরা যখন ভয়ের মধ্যে থাকে তখন তাকে দেখা যায় সম্পূর্ণ নির্ভীক। মানুষ যখন চিন্তা পেরেশানীতে জর্জরিত থাকে, তখন সে থাকে অবিচলিত।

এ সত্যের প্রতি নির্দেশ করে পবিত্র কুরআনে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বলেন,

﴿ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَلَمۡ يَلۡبِسُوٓاْ إِيمَٰنَهُم بِظُلۡمٍ أُوْلَٰٓئِكَ لَهُمُ ٱلۡأَمۡنُ وَهُم مُّهۡتَدُونَ ٨٢﴾ [الانعام: ٨٢]

“যারা ঈমান এনেছে এবং নিজ ঈমানকে যুলুম (শির্ক)-এর সাথে সংমিশ্রণ করে নি, তাদের জন্যই নিরাপত্তা এবং তারাই হিদায়াতপ্রাপ্ত”। [সূরা আল-আন‘আম, আয়াত: ৮২]

৪। তাওহীদ মানুষের মনের শক্তির উৎস। তাওহীদ মানুষের মানসিক শক্তির যোগান দেয় । ফলে তার অন্তর আল্লাহ হতে প্রাপ্তির আশায় ভরে যায়, তাঁর ওপর বিশ্বাস জন্মে এবং তাঁর ওপর ভরসা করে, তাঁর বিচারে মন খুশি থাকে, তিনি হতে আগত বিপদে সহ্য ক্ষমতা আসে।

সে শক্তির ওপর ভিত্তি করে সৃষ্টি থেকে সে মুখ ফিরিয়ে নিতে পারে। নিজ ঈমানের ওপর পাহাড়ের মত অটল হয়ে যায়। যে কোনো বিপদে পতিত হলেই মুক্তি পাওয়ার জন্য আল্লাহকে ডাকতে থাকে। কখনও মাজার কিংবা মৃতের কাছে ফরিয়াদ করতে যায় না। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিম্নোক্ত হাদীস তাদের পাথেয়:

«إذا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللهَ وَاذا اسْتَعَنْتَ فاسْتَعِنْ باللهِ»

"যখন (কিছু) চাইবে আল্লাহর কাছেই চাইবে আর যখন সাহায্য প্রার্থনা করবে আল্লাহর কাছেই প্রার্থনা করবে"।[26]

বিপদ-মুসিবত আসার সাথে সাথে তারা আল্লাহর নিম্নোক্ত নির্দেশের ওপর আমল করে:

﴿وَإِن يَمۡسَسۡكَ ٱللَّهُ بِضُرّٖ فَلَا كَاشِفَ لَهُۥٓ إِلَّا هُوَۖ وَإِن يَمۡسَسۡكَ بِخَيۡرٖ فَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيۡءٖ قَدِيرٞ ١٧﴾ [الانعام: ١٧]

"যদি আল্লাহ তোমাকে কোনো দুর্দশা দ্বারা স্পর্শ করেন, তবে তিনি ছাড়া তা দূরকারী কেউ নেই"। [সূরা আল-আন'আম, আয়াত: ১৭]

৫। তাওহীদ ভ্রাতৃত্ব ও একতার বন্ধনের মূল। কেননা আল্লাহকে ছেড়ে একদল লোক অপর দলকে প্রভু হিসাবে মান্য করবে তাওহীদ কখনই এমন অনুমোদন দেয় না। একের ওপর অপরের এ পর্যয়ের কর্তৃত্বের স্বীকৃতি দেয় না। কারণ, তাওহীদের দাবী হচ্ছে ইবাদত হবে একমাত্র

[26] তিরমিযী, হাদীস নং ২৫১৬, তিনি হাদীসটিকে হাসান সহীহ বলেছেন। আলবানী রহ. হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন।

আল্লাহর। সকল মানুষের ইবাদত পাওয়ার যোগ্যতা একমাত্র তাঁরই আছে। পৃথিবীর সকল ইবাদতকারীর মাথার মুকুট হচ্ছেন মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, যাকে আল্লাহ সকলের মধ্য হতে নির্বাচন করেছেন ।

তাওহীদের শত্রু

আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বলেন,

﴿وَكَذَٰلِكَ جَعَلۡنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوّٗا شَيَٰطِينَ ٱلۡإِنسِ وَٱلۡجِنِّ يُوحِي بَعۡضُهُمۡ إِلَىٰ بَعۡضٖ زُخۡرُفَ ٱلۡقَوۡلِ غُرُورٗاۚ ١١٢﴾ [الانعام: ١١٢]

“আর এভাবেই আমরা প্রত্যেক নবীর শত্রু করেছি মানুষ ও জিন্নের মধ্য থেকে শয়তানদেরকে। তারা প্রতারণার উদ্দেশ্যে একে অপরকে চাকচিক্যপূর্ণ কথার কুমন্ত্রণা দেয়”। [সূরা আল-আন‘আম, আয়াত: ১২]

আল্লাহ তা‘আলার অপার হিকমতের একটি হচ্ছে, তিনি জিন্নদের মধ্য হতে নবী ও তাওহীদপন্থীদের কিছু শত্রু সৃষ্টি করে দিয়েছেন। এরা কিছু মানুষকে কুমন্ত্রণা দিয়ে বাতিল ও ভ্রান্তির দিকে নিয়ে তাদের দলে ভিড়িয়ে নেয়। তাদের উদ্দেশ্য মানব সন্তানকে তাওহীদ হতে সরিয়ে বিপথগামী করা। অথচ এ তাওহীদের প্রতিই নবীগণ সর্বপ্রথম নিজ কাওমকে দাওয়াত দিতেন। তাওহীদই হচ্ছে সবকিছুর মূল, যার ওপর ভিত্তি করে ইসলামের দাওয়াত দিতে হবে। বড়ই দুঃখের বিষয়,আজ অনেকেই ধারণা করেন তাওহীদের দিকে দাওয়াত দিলে উম্মতের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি হবে। অথচ বাস্তব সত্য হলো, তাওহীদ হচ্ছে উম্মতের

ঐক্যের মূল সূত্র। ঐক্যের বিষয়টিতো তাওহীদের নামের মধ্যেই নিহিত আছে।

অন্যদিকে মহান আল্লাহকে রব, প্রতিপালক ও সৃষ্টিকর্তা হিসাবে স্বীকারকারী মুশরিকরা ওলী আল্লাহদের মাধ্যম ব্যতীত সরাসরি আল্লাহর কাছে দো'আ করতে অস্বীকার করত। অথচ এ দো'আই হচ্ছে ইবাদত। যখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক আল্লাহর ইবাদত ও তাঁর নিকট দো'আ করার দিকে ডকলেন, তখন তারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সম্বন্ধে বলল:

﴿أَجَعَلَ ٱلۡأٓلِهَةَ إِلَٰهٗا وَٰحِدًاۖ إِنَّ هَٰذَا لَشَيۡءٌ عُجَابٞ ٥﴾ [ص: ٥]

"সে কি সকল উপাস্যকে এক ইলাহ বানিয়ে নিয়েছে? নিশ্চয় এ তো এক আশ্চর্য বিষয়"। [সূরা সোয়াদ, আয়াত: ৫]

অন্যত্র আল্লাহ বলেন,

﴿كَذَٰلِكَ مَآ أَتَى ٱلَّذِينَ مِن قَبۡلِهِم مِّن رَّسُولٍ إِلَّا قَالُواْ سَاحِرٌ أَوۡ مَجۡنُونٌ ٥٢ أَتَوَاصَوۡاْ بِهِۦۚ بَلۡ هُمۡ قَوۡمٞ طَاغُونَ ٥٣﴾ [الذاريات: ٥٢، ٥٣]

"এভাবে তাদের পূর্ববর্তীদের মধ্য থেকে যে রাসূলই এসেছে, তারা বলেছে, এ তো একজন যাদুকর অথবা উন্মাদ। তারা কি একে অন্যকে এ বিষয়ে ওসিয়ত করেছে? বরং এরা সীমালঙ্ঘনকারী জাতি"। [সূরা যারিয়াত, আয়াত: ৫২-৫৩]

মুশরিকদের একটি অভ্যাস ছিল, তাদেরকে এক আল্লাহর নিকট দো'আ করার কথা বলা হলে তাদের অন্তর ঘৃনায় ভরে যেত। এ আহ্বান

প্রত্যাখ্যান করে তারা কুফুরী করত। আর আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারো নিকট দো'আ করা বা এ জাতীয় কোনো শির্কের কথা শুনলেই খুশিতে আত্মহারা হয়ে যেত এবং পরস্পরকে সুসংবাদ দিত। তাদের বর্ণনা দিয়ে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বলেন,

﴿وَإِذَا ذُكِرَ ٱللَّهُ وَحۡدَهُ ٱشۡمَأَزَّتۡ قُلُوبُ ٱلَّذِينَ لَا يُؤۡمِنُونَ بِٱلۡأٓخِرَةِۖ وَإِذَا ذُكِرَ ٱلَّذِينَ مِن دُونِهِۦٓ إِذَا هُمۡ يَسۡتَبۡشِرُونَ ٤٥﴾ [الزمر: ٤٤]

“যারা আখিরাতে বিশ্বাস করে না, এক আল্লাহর কথা বলা হলে তাদের অন্তর সঙ্কুচিত হয়ে যায়। আর আল্লাহ ছাড়া অন্য উপাস্যগুলোর কথা বলা হলে তখনই তারা আনন্দে উৎফুল হয়”। [সূরা আয-যুমার, আয়াত: ৪৪]

আল্লাহর একত্ববাদে অস্বীকার কারী মুশরিকদের সম্বন্ধে বলেন,

﴿ذَٰلِكُم بِأَنَّهُۥٓ إِذَا دُعِيَ ٱللَّهُ وَحۡدَهُۥ كَفَرۡتُمۡ وَإِن يُشۡرَكۡ بِهِۦ تُؤۡمِنُواْۚ فَٱلۡحُكۡمُ لِلَّهِ ٱلۡعَلِيِّ ٱلۡكَبِيرِ ١٢﴾ [غافر: ١٢]

“(তাদেরকে বলা হবে) এটা তো এজন্য যে, যখন আল্লাহকে এককভাবে ডাকা হত তখন তোমরা তাঁকে অস্বীকার করতে আর যখন তাঁর সাথে শরীক করা হত তখন তোমরা বিশ্বাস করতে। সুতরাং যাবতীয় কর্তৃত্ব সমুচ্চ, মহান আল্লাহর”। [সূরা গাফির, আয়াত: ১২]

এ জাতীয় আয়াতগুলো যদিও কাফিরদের সম্বন্ধে নাযিল হয়েছে, কিন্তু এগুলো সেসব লোকদের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য যারা তাদের রং-এ রঞ্জিত। যদিও তারা নিজেদের মুসলিম বলে দাবী করে। কারণ, তাদের অনেকে

আল্লাহর কাছে প্রার্থনায় ভয় করে। ঈমান ও তাওহীদের প্রতি আহ্বানকারীদের সাথে শত্রুতা পোষণ করে। সাধারণ লোকদের তাদের কাছ থেকে দুরে সরানোর জন্য তাদের ওপর নানা অপবাদ আরোপ করে ও নানা মন্দ নামে আখ্যায়িত করে। লোকদের তারা সে-ই তাওহীদ হতে দূরে সরিয়ে রাখতে চায় যার জন্য আল্লাহ রাব্বুল আলামীন সমস্ত রাসূলদের প্রেরণ করেছেন। আর যখন রাসূলুল্লাহ বা ওলী আল্লাহদের নিকট দো'আ কিংবা সাহায্য প্রার্থনার বিষয়ে শুনতে পায় তখন স্বচকিত হয়ে উঠে ও খুশিতে অন্তর ভরে যায়।

তাওহীদ প্রসঙ্গে আলিমদের ভূমিকা

নিশ্চয় আলিমগণ হচ্ছেন নবীদের ওয়ারেছ। নবীগণ তাওহীদের প্রতিই সর্বপ্রথম লোকদের দাওয়াত দিয়েছেন।

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿وَلَقَدۡ بَعَثۡنَا فِي كُلِّ أُمَّةٖ رَّسُولًا أَنِ ٱعۡبُدُواْ ٱللَّهَ وَٱجۡتَنِبُواْ ٱلطَّٰغُوتَۖ ٣٦﴾ [النحل: ٣٦]

“আর নিশ্চয় আমরা প্রত্যেক জাতির কাছে একজন রাসূল প্রেরণ করেছি যে, তোমরা আল্লাহর ইবাদত কর এবং তাগুতকে পরিহার কর”। [সূরা আন-নাহল, আয়াত: ৩৬]

তাগুত বলতে তাদেরকে বুঝানো হয়- আল্লাহ ছাড়া যাদের ইবাদত করা হয় এবং তারা তাতে রাযী-খুশি থাকে।

তাই আলিমদের কর্তব্য হলো, সেখান থেকেই তারা দাওয়াত শুরু করবেন যেখান থেকে শুরু করেছিলেন তাবত নবী-রাসূলগণ। অর্থাৎ তাওহীদ ও আল্লাহর একত্ববাদ দিয়ে দাওয়াতি মিশন শুরু করবে। যাবতীয় ইবাদত যেন এক আল্লহর জন্যই সম্পাদিত হয় সকল মানুষকে সেদিকে আহ্বান করবে। বিশেষত: দো'আ-প্রার্থনা-সাহায্য কামনা ইত্যাদি।

কারণ নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

«الدُّعَاءُ هُوَ العِبَادَةُ»

"দো'আ-ই ইবাদত"।[27]

বর্তমান বিশ্বের অধিকাংশ মুসলিম দো'আ সংক্রান্ত শির্কে আক্রান্ত। তারা নিজেদের বিপদ-মুসিবত, প্রয়োজন ইত্যাদি ক্ষেত্রে আল্লাহকে বাদ দিয়ে অন্যকে ডাকছে, তাদের নিকট প্রার্থনা করছে, তাদের দারস্থ হচ্ছে। এটাই তাদের দুর্ভাগ্যের মূল কারণ। আল্লাহ তা'আলা পূর্ব যুগের মানুষদের ধ্বংস করেছেন তার এক নম্বর কারণ, হচ্ছে, তারা আল্লাহকে ছেড়ে আউলিয়াদের কাছে প্রার্থনা করত।

[27] তিরমিযী, হাদীস নং ২৯৬৯, তিনি হাদীসটিকে হাসান সহীহ বলেছেন।

তাওহীদ প্রতিষ্ঠা ও শির্ক বিরোধী আন্দোলনে আলিমরা কয়েক ভাগে বিভক্ত

প্রথম দল:

তারা তাওহীদের মর্ম কথা, প্রয়োজনীয়তা ও তার শ্রেণিবিন্যাসকে যথাযথভাবে বুঝেছেন। পাশাপাশি তাকে ইবনষ্টকারী- শির্কের প্রকৃতি, ক্ষতিকর দিকসমূহ ও তার শ্রেণি-বিভাগ সম্পর্কেও প্রয়োজনীয় ব্যুৎপত্তি অর্জন করেছেন। এরপর সঠিক নিয়মে সে সব বিষয়ে মানুষদেরকে অবহিত করছেন নিরলসভাবে। এ ক্ষেত্রে তারা কুরআন ও সহীহ হাদীসকেই রেফারেন্স হিসাবে গ্রহণ করেছেন। ফলে, নবীদেরকে যেমন মিথ্যা অপবাদের সম্মুখীন হতে হয়েছিল তাদের ক্ষেত্রেও তার ব্যতিক্রম হয়নি। প্রতিনিয়ত প্রতিবাদ-প্রতিরোধ, বাধা-বিপত্তি, নির্যাতন-নিপীড়নের শিকার হচ্ছেন। তবে তারা আদর্শ হিসাবে গ্রহণ করেছেন নবীদেরকে তাই সহ্য করে চলেছেন শত বাধা ও নির্যাতন। দুর্বার গতিতে এগিয়ে চলেছেন আল্লাহর যমিনে আল্লাহর দীন প্রতিষ্ঠার পূণ্যময় মহান কাজে। কোনোভাবেই কর্তব্য-কাজ হতে বিরত হচ্ছেন না মুহূর্তের জন্যও।

তাদের পাথেয় হচ্ছে আল্লাহ তা‘আলার মহান বাণী,

﴿وَٱصۡبِرۡ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَٱهۡجُرۡهُمۡ هَجۡرٗا جَمِيلٗا ١٠﴾ [المزمل: ١٠]

“আর তারা যা বলে, তাতে তুমি ধৈর্য্য ধারণ কর এবং সুন্দরভাবে তাদেরকে পরিহার করে চল”। [সূরা আল-মুযযাম্মিল, আয়াত: ১০]

লুকমান তার ছেলেকে উপদেশ দিয়ে বলেছেন,

﴿يَٰبُنَيَّ أَقِمِ ٱلصَّلَوٰةَ وَأۡمُرۡ بِٱلۡمَعۡرُوفِ وَٱنۡهَ عَنِ ٱلۡمُنكَرِ وَٱصۡبِرۡ عَلَىٰ مَآ أَصَابَكَۖ إِنَّ ذَٰلِكَ مِنۡ عَزۡمِ ٱلۡأُمُورِ ١٧﴾ [لقمان: ١٧]

"হে আমার প্রিয় সন্তান, সালাত কায়েম কর, সৎকাজের আদেশ দাও, অসৎকাজে নিষেধ কর এবং তোমার ওপর যে বিপদ আসে তাতে ধৈর্য্য ধর। নিশ্চয় এগুলো অন্যতম দৃঢ় সংকল্পের কাজ"। [সূরা লুকমান, আয়াত: ১৭]

দ্বিতীয় দল:

যারা ইসলামের মূল ভিত্তি তাওহীদের দিকে দাওয়াত দেওয়াকে খুব বেশি গুরুত্ব দেন না। তারা ঘুরে ফিরে মানুষকে আকিদাহ-বিশ্বাস সহীহ না করেই সালাত, ইসলামী রাষ্ট্র গঠন ও জিহাদের দিকে ডাকে। মনে হয় তাঁরা আল্লাহ তা'আলার সে বাণীটি শুনেন নি, যাতে তিনি শির্ক সম্বন্ধে সতর্ক করে বলেছেন,

﴿وَلَوۡ أَشۡرَكُواْ لَحَبِطَ عَنۡهُم مَّا كَانُواْ يَعۡمَلُونَ ٨٨﴾ [الانعام: ٨٨]

"যদি তারা শির্কে প্রবৃত্ত হয়, তাহলে তারা যত আমলই করুক না কেন নষ্ট হয়ে যাবে"। [সূরা আল-আন'আম, আয়াত: ৮৮]

যদি তারা নবী-রাসূলদের অনুসরণ করে তাওহীদকে অগ্রাধিকার দিতেন তাহলে তাদের দাওয়াত জয়যুক্ত হত এবং আল্লাহ তাদের সাহায্য করতেন, যেমন সাহায্য করেছিলেন তিনি নবী-রাসূলদের।

আল্লাহ বলেন,

﴿وَعَدَ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مِنكُمۡ وَعَمِلُواْ ٱلصَّٰلِحَٰتِ لَيَسۡتَخۡلِفَنَّهُمۡ فِي ٱلۡأَرۡضِ كَمَا ٱسۡتَخۡلَفَ ٱلَّذِينَ مِن قَبۡلِهِمۡ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمۡ دِينَهُمُ ٱلَّذِي ٱرۡتَضَىٰ لَهُمۡ وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّنۢ بَعۡدِ خَوۡفِهِمۡ أَمۡنٗاۚ يَعۡبُدُونَنِي لَا يُشۡرِكُونَ بِي شَيۡـٔٗاۚ وَمَن كَفَرَ بَعۡدَ ذَٰلِكَ فَأُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلۡفَٰسِقُونَ ٥٥﴾ [النور: ٥٥]

"তোমাদের মধ্যে যারা ঈমান আনে এবং সৎকর্ম করে আল্লাহ তাদেরকে এ মর্মে ওয়াদা দিয়েছেন যে, তিনি নিশ্চিতভাবে তাদেরকে যমীনের প্রতিনিধিত্ব প্রদান করবেন, যেমন তিনি প্রতিনিধিত্ব প্রদান করেছিলেন তাদের পূর্ববর্তীদের এবং তিনি অবশ্যই তাদের জন্য শক্তিশালী ও সুপ্রতিষ্ঠিত করবেন তাদের দীনকে, যা তিনি তাদের জন্য পছন্দ করেছেন এবং তিনি তাদের ভয়-ভীতি শান্তি-নিরাপত্তায় পরিবর্তিত করে দেবেন। তারা আমারই ইবাদাত করবে, আমার সাথে কোন কিছুকে শরীক করবে না। আর এরপর যারা কুফুরী করবে তারাই ফাসিক"। [সূরা আন-নূর, আয়াত: ৫৫]

তৃতীয় দল:

আলেমদের মধ্যে তৃতীয় একটি দল আছে, তারা মানুষের শত্রুতার ভয়ে অথবা চাকরির ভয়ে কিংবা নিজেদের পজিশন নষ্ট হয়ে যাওয়ার ভয়ে তাওহীদের দাওয়াত দেন না এবং শির্কের বিরুদ্ধে আন্দোলন-সংগ্রাম করেন না। আল্লাহ তা'আলা দীনের তাবলীগ করার জন্য তাদেরকে যে ইলম ও মেধা দান করেছেন তা তারা গোপন করে রাখছেন।

তাদের তরে আল্লাহর নিম্নোক্ত বাণী খুবই প্রযোজ্য:

﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ يَكۡتُمُونَ مَآ أَنزَلۡنَا مِنَ ٱلۡبَيِّنَٰتِ وَٱلۡهُدَىٰ مِنۢ بَعۡدِ مَا بَيَّنَّٰهُ لِلنَّاسِ فِي ٱلۡكِتَٰبِ أُوْلَٰٓئِكَ يَلۡعَنُهُمُ ٱللَّهُ وَيَلۡعَنُهُمُ ٱللَّٰعِنُونَ ١٥٩﴾ [البقرة: ١٥٩]

"নিশ্চয় যারা গোপন করে সুস্পষ্ট নিদর্শনসমূহ ও হিদায়াত যা আমরা নাযিল করেছি, কিতাবে মানুষের জন্য তা স্পষ্টভাবে বর্ণনা করার পর, তাদেরকে আল্লাহ লা'নত করেন এবং লা'নতকারীগণও তাদেরকে লা'নত করে"। [সূরা আল-বাকারা, আয়াত: ১৫৯]

আল্লাহ দীনের পথে আহবানকারীদের সম্বন্ধে বলেন,

﴿ٱلَّذِينَ يُبَلِّغُونَ رِسَٰلَٰتِ ٱللَّهِ وَيَخۡشَوۡنَهُۥ وَلَا يَخۡشَوۡنَ أَحَدًا إِلَّا ٱللَّهَۗ وَكَفَىٰ بِٱللَّهِ حَسِيبٗا ٣٩﴾ [الاحزاب: ٣٩]

"যারা আল্লাহর রিসালাতকে মানুষের কাছে পৌঁছে দেয় এবং তাঁকে ভয় করে। আল্লাহ ছাড়া আর কাউকেই ভয় করে না"। [সূরা আল-আহযাব, আয়াত: ৩৯]

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

«مَنْ كَتَمَ عِلْمًا أَلْجَمَهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِلِجَامٍ مِنْ نَارٍ»

"যে ইলম গোপন রাখবে, আল্লাহ কিয়ামত দিবসে তার মুখে আগুনের লাগাম পরাবেন"।[28]

---

[28] হাকেম, হাদীস নং ৩৪৬, তিনি শাইখাইনের শর্তে সহীহ বলেছেন। যাহাবী রহ. ও সহীহ বলেছেন।

চতুর্থ দল:

আলিমদের চতুর্থ দলটির বক্তব্য হচ্ছে, কেবল আল্লাহর নিকটই দো‘আ করতে হবে এমন কোনো কথা নেই; বরং নবী, আউলিয়া ও মৃতদের কাছে দো‘আ করা জায়েয। তারা বলেন, আল্লাহ ছাড়া অন্যের কাছে দো‘আ করার ব্যাপারে সতর্ক করে যে সব আয়াত নাযিল হয়েছে তা শুধু মুশরিকেদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। মুসলিমদের কেউই মুশরিকদের অন্তর্ভূক্ত নয়।

মনে হচ্ছে তারা আল্লাহ তা‘আলার সে বাণীটি শুনতে পান নি যাতে তিনি বলেছেন,

﴿ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَلَمۡ يَلۡبِسُوٓاْ إِيمَٰنَهُم بِظُلۡمٍ أُوْلَٰٓئِكَ لَهُمُ ٱلۡأَمۡنُ وَهُم مُّهۡتَدُونَ ٨٢﴾ [الانعام: ٨٢]

“যারা ঈমান এনেছে এবং স্বীয় ঈমানকে যুলম (শিরক)-এর সাথে মিশ্রণ করে নি। তাদের জন্য রয়েছে নিরাপত্তা এবং তারাই হিদায়াত প্রাপ্ত”। [সূরা আল-আন‘আম, আয়াত।: ৮২]

এই আয়াত হতে বুঝা যাচ্ছে শির্কের মধ্যে মুমিন-মুসলিমও পতিত হতে পারে, যা আজ অধিকাংশ মুসলিম দেশেই পরিলক্ষিত হচ্ছে। এসব আলিম আল্লাহ ছাড়া অন্যের কাছে দো‘আ করা, মসজিদে কবর দেওয়া, কবরের চরিদিকে তাওয়াফ করা, ওলী-আউলিয়াদের নামে নযর-মানত দেওয়া সহ বহু শির্ক, বিদ‘আত ও মারাত্মক মারাত্মক মন্দ কাজকে মুবাহ করে দিয়েছে।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের ব্যাপারে সাবধান করে বলে গেছেন:

«إِنَّمَا أَخَافُ عَلَى أُمَّتِي الأَئِمَّةَ المُضِلِّينَ»

“আমি আমার উম্মতের জন্য বিপথগামীকারী ইমাম ও নেতৃবর্গের আশঙ্কা করছি”।[29]

খুবই বিস্ময়কর ব্যাপার! একবার একটি প্রশ্নের জবাবে জামেয়া আযহারের জনৈক শাইখ কবরের দিকে সালাত আদায় করাকে জায়েয বলে মন্তব্য করেন। তিনি বলেন, কেন কররের দিকে সালাত আদায় করা জায়েয হবে না? অথচ আল্লাহর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মসজিদে নাওয়াওয়ীতে শায়িত আছেন এবং মানুষ তার কবরের দিকে সালাত আদায় করছে।

আমরা তার যুক্তি খন্ডন করে বলতে পারি, প্রথমত: নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে মসজিদে দাফন করা হয় নি, বরং তাঁকে দাফন করা হয় আয়েশা রাদিয়াল্লাহু ‘আনহার ঘরে। উমাইয়াদের সময় তাঁর কবরকে মসজিদের ভিতরে প্রবেশ করান হয়। দ্বিতীয়ত: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কবরের দিকে সালাত আদায় করতে নিষেধ করেছেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সব সময় পাঠ করতেন:

[29] তিরমিযী, হাদীস নং ২২২৯, তিনি হাদীসটিকে হাসান সহীহ বলেছেন। আলবানী রহ. সহীহ বলেছেন।

«اللّهُمَّ إِنِّ أعُوْذُبِكَ مِنْ عِلْمٍ لا يَنْفَعْ»

“হে আল্লাহ, আমি এমন ইলম থেকে বাঁচতে চাই যা কোনো উপকার দেয় না”।[30] অর্থাৎ যা আমি অপরকে শিখাব না, না আমি নিজে তাতে আমল করব এবং না তা আমার চরিত্রকে সংশোধন করবে।

পঞ্চম দল:

এমন আলিম যারা নিজ বুজুর্গদের কথা মান্য করে আর আল্লাহর হুকুম অমান্য করার ব্যাপারে তাদের আনুগত্য করে। প্রকৃত অর্থে তারা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপদেশের বিপরীতে অবস্থান নিয়েছে, নবীজী বলেন,

«لَا طَاعَةَ لِمَخْلُوقٍ فِي مَعْصِيَةِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ»

“স্রষ্টার অবাধ্যতার কাজে সৃষ্টির আনুগত্য করা যাবে না”।[31]

এতে করে তারা অতি শীঘ্রই কিয়ামত দিবসে আফসোস করবে, যে দিন আফসোসে কোনো কাজ হবে না।

আল্লাহ কাফিরদের আযাব বর্ণনা করছেন, যারা তাদের পথ অনুসরণ করবে তাদের সম্বন্ধেও বলছেন:

---

[30] সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ২৭২২।

[31] মুসনাদ আহমদ, হাদীস নং ১০৯৪, শুয়াইব আরনাউত হাদীসটিকে বুখারী ও মুসলিমের শর্তে সহীহ বলেছেন।

﴿يَوۡمَ تُقَلَّبُ وُجُوهُهُمۡ فِي ٱلنَّارِ يَقُولُونَ يَٰلَيۡتَنَآ أَطَعۡنَا ٱللَّهَ وَأَطَعۡنَا ٱلرَّسُولَا۠ ٦٦ وَقَالُواْ رَبَّنَآ إِنَّآ أَطَعۡنَا سَادَتَنَا وَكُبَرَآءَنَا فَأَضَلُّونَا ٱلسَّبِيلَا۠ ٦٧ رَبَّنَآ ءَاتِهِمۡ ضِعۡفَيۡنِ مِنَ ٱلۡعَذَابِ وَٱلۡعَنۡهُمۡ لَعۡنٗا كَبِيرٗا ٦٨﴾ [الاحزاب: ٦٦، ٦٨]

“যেদিন তাদের চেহারাগুলো আগুনে উপুড় করে দেওয়া হবে, তারা বলবে, ‘হায়, আমরা যদি আল্লাহর আনুগত্য করতাম এবং রাসূলের আনুগত্য করতাম। তারা আরো বলবে, ‘হে আমাদের রব, আমরা আমাদের নেতৃবর্গ ও বিশিষ্ট লোকদের আনুগত্য করেছিলাম, তখন তারা আমাদেরকে পথভ্রষ্ট করেছিল। হে আমাদের রব, আপনি তাদেরকে দ্বিগুণ আযাব দিন এবং তাদেরকে বেশি করে লানত করুন”। [সূরা আল-আহযাব, আয়াত: ৬৬-৬৮]

আল্লামা ইবন কাসির রহ. এই আয়াতের তাফসীরে বলেন, আমরা নেতাদের ও বড় বড় বুজুর্গদের অনুসরণ করেছিলাম আর বিরোধিতা করেছিলাম রাসূলদের এবং এ ধারণা পোষণ করেছিলাম যে, নিশ্চয় তাঁদের কাছে কিছু আছে এবং তারাও কোনো কিছুর ওপর আছে। কিন্তু এখন দেখছি তারা কোনো কিছুরই ওপর নেই।

ওহাবী অর্থ কী?

আজকাল সাধারণে ওহাবী শব্দটি বেশ পরিচিত হয়ে উঠেছে, ওহাবী বলে সেসব লোকদেরকে বুঝানো হয়, যারা কুরআন ও সহীহ হাদীসের পরিপন্থী সমাজে প্রচলিত নানা কুপ্রথা ও নিকৃষ্ট বিদ'আতের বিরুদ্ধে কথা বলেন এবং কুরআন সুন্নাহ ভিত্তিক আমল করেন। প্রচলিত ধ্যান-ধারণা এড়িয়ে কুরআন-হাদিস সমর্থিত আক্বীদা পোষণ করাই তাদের অন্যায়। বিশেষ করে তাওহীদের প্রতি দাওয়াত এবং অন্যদের ছেড়ে একমাত্র আল্লাহর কাছে দো'আ করতে বলা হলেতো কথাই নেই।

(লেখক বলছেন) আমি আমার শাইখের কাছে ইবন আব্বাসের রাদিয়াল্লাহু 'আনহু বিখ্যাত সে হাদীসটি পাঠ করেছিলাম: যাতে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

«إذا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللهَ وَاذا اسْتَعَنْتَ فاسْتَعِنْ باللهِ»

"যখন (কিছু) চাইবে আল্লাহর কাছেই চাইবে আর যখন সাহায্য প্রার্থনা করবে আল্লাহর কাছেই প্রার্থনা করবে"।[32]

এর ব্যাখ্যায় ইমাম নাওয়াওয়ী রহ. বলেছেন, প্রার্থিত জিনিস যদি এমন হয় যা মানুষের হাতে নেই। যেমন, হিদায়াত, ইলম, রোগমুক্তি ও সুস্থতা- তাহলে যেন একমাত্র রবের কাছেই চায়। তখন আমি আমার উস্তাদকে বললাম: এ হাদীস ও তার মর্ম আল্লাহ ছাড়া অন্যের কাছে

[32] তিরমিযী, হাদীস নং ২৫১৬, তিনি হাদীসটিকে হাসান সহীহ বলেছেন। আলবানী রহ. হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন।

সাহায্য চাওয়াকে নাজায়েয বলেছে। তিনি বললেন: বরং জায়েয। তখন বললাম: আপনার নিকট এর কি দলীল আছে? এতে শাইখ খুব রেগে গেলেন এবং চেঁচিয়ে বলতে লাগলেন: আমার চাচী এভাবে বলেন, হে শাইখ সাদ! (ঐ মসজিদের নিচে কবরে শায়িত ব্যক্তি, তার নিকট সাহায্য চাইতে)। তখন আমি বললাম, হে চাচী! তোমাকে কি শাইখ সাদ কোনো উপকার করতে পারে? উত্তরে বললেন: আমি তার কাছে দো'আ করি এবং তখন তিনি আল্লাহর কাছে গিয়ে আমার জন্য শাফায়াত করেন।

আমি তখন শাইখকে বললাম: আপনি জ্ঞানী মানুষ। সারা জীবন কুরআন-কিতাব পাঠ করে কাটালেন। এরপরও কি আপনার আকিদাহ আপনার অজ্ঞ চাচীর কাছ থেকে নিবেন? তিনি তখন রেগে বললেন: তোমার মধ্যে ওহাবীদের চিন্তা-ভাবনা দেখা যাচ্ছে। ওমরাহ পালন করতে যাও আর তাদের কিতাব নিয়ে ফেরত আস। আসলে আমি ওহাবীদের সম্বন্ধে বলতে গেলে কিছুই জানতাম না, আমার উস্তাদের কাছ থেকে শুধু এতটুকু শুনতাম যে, ওহাবীরা সমস্ত মানুষদের বিরুদ্ধাচরণ করে, তারা ওলী-আউলিয়া ও তাদের কারামত বিশ্বাস করে না। তারা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ভালোবাসে না এবং এ জাতীয় আরও বহু অপবাদ। তখন আমি মনে মনে বললাম, যদি ওহাবীরা বিশ্বাস করে শুধুমাত্র আল্লাহর কাছে সাহায্য চাইতে হবে এবং সুস্থতা দানের মালিক শুধু তিনি। তাহলে অবশ্যই আমাকে তাদের সম্বন্ধে জানতে হবে। তারপর তাদের সম্পর্কে জানতে গিয়ে শুনলাম, একটি নির্দিষ্ট জয়গায় তারা বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় একত্রিত হয়।

তাফসীর, হাদীস ও ফিকাহ নিয়ে আলোচনা হয়। সে মতে এক বৃহস্পতিবার আমি আমার ছেলেদের সহ আরো কিছু শিক্ষিত যুবকদের নিয়ে সেখানে গেলাম। একটা কক্ষে প্রবেশ করে দরসের জন্য অপক্ষা করতে লাগলাম। কিছুক্ষণ পর আমাদের সামনে একজন শাইখ আসলেন। সালাম জানিয়ে ডান দিক হতে শুরু করে সবার সাথে হাত মিলালেন। এরপর নির্ধারিত চেয়ারে বসলেন। আমি লক্ষ্য করলাম কেউ তাঁর সম্মানে দাঁড়াল না। আমি মনে মনে বললাম: এ শাইখ খুবই নম্র ও বিনিত লোক। নিজ সম্মানে অন্যদের দাঁড়ানোকে পছন্দ করেন না। কিছুক্ষণ পর তিনি সে খুতবা পড়ে দরস শুরু করলেন, যা নবী কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজ খুতবা ও দরস দেওয়ার সময় বলতেন। খুতবার পর অত্যন্ত প্রাঞ্জল ও বিশুদ্ধ আরবী ভাষায় কথা বলতে লাগলেন এবং হাদীস সম্বন্ধে আলোচনা শুরু করলেন- হাদীসের সনদ সহীহ না দুর্বল তাও বলে দিলেন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নাম যতবার আসল ততবারই দুরূদ পাঠ করলেন। আলোচনার শেষ ভাগে লিখিত প্রশ্নাবলী পেশ করা হলো। তিনি কুরআন ও হাদীসের দলীলসহ সবগুলো প্রশ্নেরই উত্তর দিলেন। উপস্থিত কতিপয় ব্যক্তিবর্গ তার সাথে আলোচনা করতে চাইলে কাউকে বিমুখ করলেন না। দরসের শেষে বললেন: সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর যিনি আমাকে মুসলিম বানিয়েছেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তাঁর সাহাবীদের অনুসরণ করে চলার তাওফীক দিয়েছেন। কিছু লোক আমাদের সম্বন্ধে মন্তব্য করে বলে তোমরা ওহাবী। এটা হচ্ছে মানুষকে দেওয়া নিকৃষ্ট উপাধি। এরূপ করতে আল্লাহ নিষেধ করেছেন:

﴿وَلَا تَنَابَزُواْ بِٱلۡأَلۡقَٰبِۖ ١١﴾ [الحجرات: ١١]

“তোমরা একে অপরকে মন্দ উপনামে ডেকো না”। [সূরা আল-হুজরাত, আয়াত: ১১]

অতীতে ইমাম শাফেঈ রহ.-কে রাফেজি বলে আখ্যায়িত করা হলে তিনি এক কবিতার মাধ্যমে তার উত্তর দেন, যার সারমর্ম হলো:

যদি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং তাঁর বংশীয়দের ভালোবাসার নাম রাফেজি হয় তাহলে মানুষ ও জিন সকলে সাক্ষী থেকো, আমিও রাফেজি।

শাইখের দরস শেষ হলে কিছু সংখ্যক যুবকের সাথে বের হয়ে আসলাম তারা তাঁর ইলম ও ইবনম্র ব্যবহারে বিমুগ্ধ হয়ে পড়েছিল। তাদের একজন বলেই বসল, ইনি সত্যই শাইখ।

ওহাবী বলার ইতিহাস

তাওহীদের শত্রুরা তাওহীদপন্থীদের মুহাম্মাদ ইবন আব্দুল ওয়াহাবের প্রতি সম্বন্ধযুক্ত করে ওহাবী নামে আখ্যায়িত করে। যদি তারা সত্যবাদিই হত তাহলে তাঁর মূল নাম মুহাম্মাদের সাথে সম্পর্ক করে বলত মুহাম্মাদী। কিন্তু আল্লাহ চাইলেন তাওহীদপন্থীরা তাঁর নাম ওহাব বা দাতা-এর সাথে সম্পর্কিত হউক। তাই থেকে হয়ে গেল ওহাবী। যদি সূফী বলতে সূফ বা পশমী কাপড় পরিধানকারী লোকদের সাথে সম্পর্কিত মানুষদের বুঝায়, তাহলে ওহাবী মানে আল্লাহর নাম ওহাব

(যিনি মানুষকে একত্ববাদ দান করেন) এর সাথে সম্পর্কিত লোকদের বুঝাবে।

মুহাম্মাদ ইবন আব্দুল ওয়াহেবের জীবনী

মুহাম্মাদ ইবন আব্দুল ওয়াহাব সৌদি আরবের অন্তর্গত নজদ এলাকায় ওয়াইনাহ নামক স্থানে ১১১৫ হিজরীতে জন্ম গ্রহণ করেন। ১০ বছরে পদার্পণ করার পূর্বেই পবিত্র কুরআন মুখস্থ করেন। নিজ পিতার -যিনি হাম্বলী মাযহাবের একজন বিশেষ আলিম ছিলেন- নিকট হতে ফিকাহ শিখেন। তারপর বিভিন্ন ওস্তাদের নিকট হাদীস ও তাফসীর শাস্ত্রে শিক্ষা লাভ করেন। বিভিন্ন এলাকায় বিশেষত: মদিনা শরীফ গিয়ে কুরআন হাদীসের ওপর বিশেষভাবে গবেষণার মাধ্যমে তাওহীদের জ্ঞান লাভ করেন। শৈশব থেকেই নিজ এলাকাতে যে সব শির্ক বিদ'আত ও কুসংস্কার প্রচলিত ছিল সেগুলো খুব খেয়াল রাখেন। যেমন, কবরকে পবিত্র ও বরকতময় জ্ঞান করে পূজা করা, যা ছিল সত্যিকারের ইসলাম পরিপন্থী। মাঝে মাঝে শুনতেন তার এলাকার মেয়েরা পুরুষ খেজুর গাছের কাছে ওছীলা চেয়ে বলত: হে পালের গোদা, বছর পূর্ণ হবার পূর্বে যেন স্বামী পাই। এ ছাড়া হেজাজে দেখতে পান বিভিন্ন সাহাবী ও রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বংশধরদের কবর পূজা করা হচ্ছে। মদিনা শরিফে শুনতেন, লোকেরা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কবরে গিয়ে আল্লাহকে ছেড়ে তাঁর নিকট বিপদ মুক্তি চাচ্ছে। আল্লাহকে ছেড়ে তাঁকে ডাকাডাকি করছে। এ সবই ছিল

কুরআন ও নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কথার বিপরীত। কারণ, রাব্বুল আলামীন বলেন,

﴿وَلَا تَدۡعُ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَا لَا يَنفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَۖ فَإِن فَعَلۡتَ فَإِنَّكَ إِذٗا مِّنَ ٱلظَّٰلِمِينَ ١٠٦﴾ [يونس: ١٠٦]

"আর আল্লাহ ছাড়া এমন কিছুকে ডেকো না, যা তোমার উপকার করতে পারে না এবং তোমার ক্ষতিও করতে পারে না। অতএব তুমি যদি কর, তাহলে নিশ্চয় তুমি যালিমদের অন্তর্ভুক্ত হবে"। [সূরা ইউনুস, আয়াত: ১০৬]

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একদা ইবন আব্বাসকে রাদিয়াল্লাহু 'আনহু বললেন:

«إذا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللهَ وَاذا اسْتَعَنْتَ فاسْتَعِنْ باللهِ»

"যখন (কিছু) চাইবে আল্লাহর কাছেই চাইবে আর যখন সাহায্য প্রার্থনা করবে আল্লাহর কাছেই প্রার্থনা করবে"।[33]

এতসব দেখে তিনি তার এলাকাবাসীদেরকে তাওহীদ ও এক আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করার দিকে ডাকতে শুরু করলেন। যুক্তি দিয়ে বললেন, তিনিই শ্রষ্টা এবং এবং তিনিই দাতা। অন্যরা কারও কোনো কষ্ট দুর করতে সমর্থ নয়, এমনকি নিজেদেরও না। নেককারদের সাথে ভালোবাসার অর্থ হলো তাদের অনুসরণ করা, তাদেরকে আল্লাহ ও

---

[33] তিরমিযী, হাদীস নং ২৫১৬, তিনি হাদীসটিকে হাসান সহীহ বলেছেন। আলবানী রহ. হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন।

মানুষের মধ্যে মধ্যস্থতাকারী বানানো নয়। আল্লাহকে ছেড়ে তাদের কাছে কোনো জিনিস চাওয়া নয়।

১- তার এ সব তাওয়াতি কর্মসূচী দেখে বাতিল পন্থীরা তাঁর বিরুদ্ধে খাড়া হয়ে গেল। তিনি তাওহীদের দাওয়াত দিতে শুরু করলেন আর বিদ‘আতীরা তার বিরুদ্ধে খাড়া হলো। এটা খুবই স্বাভাবিক। কারণ, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন একত্ববাদের দাওয়াত নিয়ে তৈরি হলেন তখন মক্কার কাফিররা আবাক হয়ে বলেছিল:

﴿أَجَعَلَ ٱلۡأٓلِهَةَ إِلَٰهٗا وَٰحِدًاۖ إِنَّ هَٰذَا لَشَيۡءٌ عُجَابٞ ۝٥﴾ [ص: ٥]

“সে কি সমস্ত মা‘বুদকে এক মা‘বুদ বানাতে চায়, এটাত সত্যই খুব অবাক হওয়ার কথা”। [সূরা সোয়াদ, আয়াত: ৫]।

তখন তাঁর বিরুদ্ধে আন্দোলন শুরু হয়ে গেল তুমুলভাবে। তাঁর সম্বন্ধে নানা ধরণের মিথ্যা কথার প্রচার শুরু হলো- যাতে তাঁর দাওয়াত কর্ম বন্ধ হয়ে যায়; কিন্তু মহান আল্লাহ দাওয়াতের হিফাযত করলেন। এ কাজের জন্য এমন এক দল লোক তৈরি করে দিলেন, যারা সে দাওয়াতের কাজ নিয়ে ছড়িয়ে পড়ল সারা হেজাজসহ অন্যান্য ইসলামী দেশগুলোয়। কিন্তু তা সত্ত্বেও আজ পর্যন্ত অনেক লোকই তাঁর সম্বন্ধে মিথ্যা প্রচার চালিয়ে যাচ্ছে। তাদের বক্তব্য হচ্ছে, তিনি পঞ্চম মাযহাবের প্রতিষ্ঠা করেছেন। আসলে তিনি হাম্বলী মাযহাবের অনুসারী ছিলেন। তারা বলে: ওয়াহাবীরা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ভালোবাসে না। তাঁর ওপর দুরূদ পাঠ করে না। অথচ তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবনী গ্রন্থ জাদুল মায়াদকে সংক্ষিপ্ত

করেছেন। এ ধরণের আরো বহু অপবাদ দেওয়া হয়। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন এসব অপবাদের বিচার করবেন কিয়ামত দিবসে। যদি তারা তার বইপত্র পাঠ করত তাহলে দেখত- সেগুলো কুরআন, হাদীস ও সাহাবীদের কথায় পূর্ণ।

২- হাদীসে আছে: ইবন উমার রাদিয়াল্লাহু 'আনহুমা থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

«اللَّهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِي شَامِنَا، وَفِي يَمَنِنَا» قَالَ: قَالُوا: وَفِي نَجْدِنَا؟ قَالَ: قَالَ: «اللَّهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِي شَامِنَا وَفِي يَمَنِنَا» قَالَ: قَالُوا: وَفِي نَجْدِنَا؟ قَالَ: قَالَ: «هُنَاكَ الزَّلاَزِلُ وَالفِتَنُ، وَبِهَا يَطْلُعُ قَرْنُ الشَّيْطَانِ»

"হে আল্লাহ! বরকত দাও আমাদের শামে এবং ইয়ামানে। লোকেরা বলল: আমাদের নজদে। তিনি বললেন: ওখান ভূমিকম্প ও বিভিন্ন ফেতনা হবে। সেখানে শয়তানের শিং উঠবে"।[34]

এ হাদীসের ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে ইবন হাজার আসকালানী ও অন্যান্য আলিমরা বলেছেন, হাদীসে যে নজদের কথা বলা হয়েছে তার অবস্থান ইরাকে। কারণ, সেখান থেকেই ফিতনা শুরু হয়েছে। যেখানে হোসাইন রাদিয়াল্লাহু 'আনহু কে শহীদ করা হয়। কিন্তু কিছু লোক মনে করে বর্ণিত নজদ হলো হেজাজের নজদ। অথচ ইরাকে যে ধরণের ফিতনা প্রকাশ পেয়েছে সে রকম কোনো ফিতনা সৌদি আরবের নজদ থেকে প্রকাশ পায় নি। হেজাজের নজদ থেকে প্রকাশ পেয়েছে সে তাওহীদ

[34] সহীহ বুখারী, হাদীস নং ১০৩৭।

যার জন্য আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বিশ্ব জগতকে সৃষ্টি করেছেন এবং সমস্ত রাসূলদের প্রেরণ করেছেন।

৩- কিছু ন্যায় পরায়ণ আলিম বলেছেন, তিনি হিজরী ১১ শতাব্দীর মোজাদ্দেদ। তারা তার সম্বন্ধে গ্রন্থ লিখেছেন। যেমন শাইখ আলী আল-তানতাভী রহ. যিনি বড় বড় ব্যক্তিত্বদের সম্বন্ধেও বহু বই লিখেছেন। শাইখ মুহাম্মাদ ইবন আব্দুল ওয়াহাব রহ. নামক বইতে তিনি লিখেছেন, হিন্দুস্তান ও অন্যান্য প্রত্যন্ত অঞ্চলে একত্ববাদের ধ্যান-ধারণা পৌছেঁছে মুসলিম হাজীদের দ্বারা, যারা মক্কা থেকে এই সম্বন্ধে ধারণা নিয়েছেন। ফলে ইংরেজ ও ইসলামের অন্যান্য শত্রুরা এর বিরুদ্ধে আন্দোলন শুরু করল। কারণ, একমাত্র তাওহীদই মুসলিমদেরকে নিজ শত্রুদের বিরুদ্ধে একত্রিত করে । ফলে, তারা এমন অবস্থা সৃষ্টি করল, যে ব্যক্তিই তাওহীদের দিকে মানুষকে ডাকে তাকেই তারা ওহাবী নামে আখ্যায়িত করে। তাদের মূল উদ্দেশ্য ছিল মুসলিমরা যেন সে তাওহীদ থেকে সরে যায় যে তাওহীদ এক আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করার শিক্ষা দেয়।

তাওহীদ ও শির্কের দ্বন্দ্ব

১। তাওহদী ও শির্কের দ্বন্দ্ব বহু পুরাতন। নূহ 'আলাইহিস সালাম-এর যুগ থেকেই এর সূচনা। যখন তিনি তাঁর সম্প্রদায়কে মূর্তি পূজা ছেড়ে এক আল্লাহর ইবাদতের দিকে ডেকেছিলেন তখন থেকেই এটি শুরু হয়। তিনি সাড়ে নয়শত বছর পর্যন্ত তাদেরকে তাওহীদের দাওয়াত

দেন; কিন্তু তারা তাঁকে অমান্য করে ও তার বিরাদ্ধাচরণ করে। সে সম্পর্কে পবিত্র কুরআনে আল্লাহ বলেন,

﴿وَقَالُواْ لَا تَذَرُنَّ ءَالِهَتَكُمۡ وَلَا تَذَرُنَّ وَدّٗا وَلَا سُوَاعٗا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسۡرٗا ۝٢٣ وَقَدۡ أَضَلُّواْ كَثِيرٗاۖ ۝٢٤﴾ [نوح: ٢٣، ٢٤]

"আর তারা বলে, 'তোমরা তোমাদের উপাস্যদের বর্জন করো না; বর্জন করো না ওয়াদ, সুওয়া, ইয়াগূছ, ইয়া'ঊক ও নাসরকে'।বস্তুত তারা অনেককে পথভ্রষ্ট করেছে"। [সূরা নূহ, আয়াত: ২৩-২৪]

সহীহ বুখারীতে ইবন আব্বাস রাদিয়াল্লাহু 'আনহু থেকে এই আয়াতের তাফসিরে বলা হয়েছে: এঁরা ছিলেন নূহ 'আলাইহিস সালাম-এর সমপ্রদায়ের মধ্যে ভালো ও নেককার লোক। তারা মারা গেলে শয়তান তাদের গোত্রের লোকদের কাছে গোপনে বলল, তারা যেখানে বসতেন সেখানে তাদের প্রতিমূর্তি তৈরি কর এবং এগুলোকে তাঁদের নামে বিভূষিত কর। তারা তাই করল; কিন্তু তখনও পর্যন্ত তাদের ইবাদত করা হত না। যখন এরা মারা গেল তখন কেন যে মূর্তিগুলি বানান হয়েছিল তা পরবর্তী লোকেরা ভুলে গেল। ফলে, তখন থেকেই মূর্তি ও পাথরের পূজা শুরু হয়ে গেল।

২। এরপর থেকে (অর্থাৎ নূহ 'আলাইহিস সালামের পর) যত রাসূল আগমন করেছেন তাদের প্রত্যেকে এক আল্লাহর ইবাদতের দিকে ডাকতে শুরু করলেন এবং আল্লাহ ব্যতীত সকল বাতেল- অযোগ্য মা'বুদদের ত্যাগ করতে বললেন। এ বিষয়ে পবিত্র কুরআন ভরপুর।

আল্লাহ বলেন,

﴿۞وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمۡ هُودٗاۚ قَالَ يَٰقَوۡمِ ٱعۡبُدُواْ ٱللَّهَ مَا لَكُم مِّنۡ إِلَٰهٍ غَيۡرُهُۥٓۚ أَفَلَا تَتَّقُونَ ٦٥﴾ [الاعراف: ٦٤]

"আর (প্রেরণ করলাম) আদ জাতির নিকট তাদের ভাই হূদকে। সে বলল, হে আমার কাওম, তোমরা আল্লাহর ইবাদত কর। তিনি ছাড়া তোমাদের কোন (সত্য) ইলাহ নেই। তোমরা কি তাকওয়া অবলম্বন করবে না?" [সূরা আর-আ'রাফ, আয়াত: ৬৪]

অন্যত্র বলেন,

﴿۞وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمۡ صَٰلِحٗاۚ قَالَ يَٰقَوۡمِ ٱعۡبُدُواْ ٱللَّهَ مَا لَكُم مِّنۡ إِلَٰهٍ غَيۡرُهُۥۖ ٦١﴾ [هود: ٦١]

"আর সামূদ জাতির নিকট (পাঠিয়েছিলাম) তাদের ভাই সালেহকে। সে বলল, হে আমার কাওম, তোমার আল্লাহর ইবাদত কর, তিনি ছাড়া তোমাদের কোন (সত্য) ইলাহ নেই"। [সূরা হূদ, আয়াত: ৬১]

আরও বলেন,

﴿وَإِلَىٰ مَدۡيَنَ أَخَاهُمۡ شُعَيۡبٗاۚ قَالَ يَٰقَوۡمِ ٱعۡبُدُواْ ٱللَّهَ مَا لَكُم مِّنۡ إِلَٰهٍ غَيۡرُهُۥۖ ٨٤﴾ [هود: ٨٤]

"আর মাদইয়ানে আমি (পাঠিয়েছিলাম) তাদের ভাই শুআইবকে। সে বলল, হে আমার কাওম, তোমরা আল্লাহর ইবাদত কর, তিনি ছাড়া তোমাদের কোন (সত্য) ইলাহ নেই"। [সূরা হূদ, আয়াত: ৮৪]

আল্লাহ তা‘আলা আরো বলেন,

﴿وَإِذۡ قَالَ إِبۡرَٰهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوۡمِهِۦٓ إِنَّنِي بَرَآءٞ مِّمَّا تَعۡبُدُونَ ٢٦ إِلَّا ٱلَّذِي فَطَرَنِي فَإِنَّهُۥ سَيَهۡدِينِ ٢٧﴾ [الزخرف: ٢٦، ٢٧]

“আর স্মরণ কর, যখন ইবরাহীম স্বীয় পিতা ও তার কাওমকে বলেছিল, তোমরা যেগুলুর ইবাদত কর, নিশ্চয় আমি তাদের থেকে সম্পূর্ণমুক্ত। তবে (তিনি ছাড়া) যিনি আমাকে সৃষ্টি করেছেন। অতঃপর নিশ্চয় তিনি আমাকে শীঘ্রই হেদায়াত দিবেন”। [সূরা যুখরুফ, আয়াত: ২৬-২৭]

মুশরিকরা সকল নবীরই বিরোধিতা করত এবং অহঙ্কারের সাথে মুখ ঘুরিয়ে নিত। আর তাদের আনিত দাওয়াত উপেক্ষা করত। একে বাধাগ্রস্ত করার জন্য সকল শক্তি প্রয়োগ করত।

৩। আমাদের রাসূল মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, যিনি নবুয়ত পাওয়ার আগে নিজ জাতির কাছে আল আমীন তথা বিশ্বাসী বলে পরিচিত ছিলেন। এ নামেই সকলের কাছে সমাদৃত ছিলেন। কিন্তু যখনই তাদেরকে এক আল্লাহর ইবাদতের দিকে ডাকলেন এবং বাপ দাদাদের অনুসৃত মূর্তি পূজা ত্যাগের আহ্বান জানালেন। তখনই তাঁর সত্যবাদিতা ও আমানতদারীতার কথা ভুলে গেল। বরং উল্টো বলতে লাগল: তিনি মিথ্যবাদী, যাদুকর। পবিত্র কুরআন তাদের বিরোধিতা করে বর্ণনা করছে:

﴿وَعَجِبُوٓاْ أَن جَآءَهُم مُّنذِرٞ مِّنۡهُمۡۖ وَقَالَ ٱلۡكَٰفِرُونَ هَٰذَا سَٰحِرٞ كَذَّابٌ ٤ أَجَعَلَ ٱلۡأٓلِهَةَ إِلَٰهٗا وَٰحِدًاۖ إِنَّ هَٰذَا لَشَيۡءٌ عُجَابٞ ٥﴾ [ص: ٤، ٥]

"আর তারা বিস্মিত হলো যে, তাদের কাছে তাদের মধ্য থেকেই একজন সতর্ককারী এসেছে এবং কাফিররা বলে, এ তো যাদুকর, মিথ্যাবাদী। সে কি সকল উপাস্যকে এক ইলাহ বানিয়ে নিয়েছে? নিশ্চয় এ তো এক আশ্চর্য বিষয়"। [সূরা সোয়াদ, আয়াত: ৪-৫]

অন্যত্র বলেন,

﴿كَذَٰلِكَ مَآ أَتَى ٱلَّذِينَ مِن قَبۡلِهِم مِّن رَّسُولٍ إِلَّا قَالُواْ سَاحِرٌ أَوۡ مَجۡنُونٌ ۝٥٢ أَتَوَاصَوۡاْ بِهِۦۚ بَلۡ هُمۡ قَوۡمٞ طَاغُونَ ۝٥٣﴾ [الذاريات: ٥٢، ٥٣]

"এভাবে তাদের পূর্ববর্তীদের মধ্য থেকে যে রাসূলই এসেছে, তারা বলেছে, এ তো একজন যাদুকর অথবা উন্মাদ। তারা কি একে অন্যকে এ বিষয়ে ওসিয়ত করেছে? বরং এরা সীমালঙ্ঘনকারী জাতি"। [সূরা যারিয়াত, আয়াত: ৫২-৫৩]।

এটিই হচ্ছে সকল নবী-রাসূলের তাওহীদের প্রতি দাওয়াত দেওয়ার পরের অবস্থা। এটিই তাঁদের মিথ্যাবাদী কাওম ও অপবাদ দানকারীদের ভূমিকা।

৪। আমাদের বর্তমান সময়ে কোনো মুসলিম তার অপর মুসলিম ভাইদেরকে চরিত্র সংশোধন, সততা ও আমানতদারীতা রক্ষা করার প্রতি দাওয়াত দিলে তাকে কোনোরূপ বিরোধিতার সম্মুখীন হতে হয় না। কিন্তু যখনই তাওহীদ তথা এক আল্লাহকে ডাকা ও বিপদ-মুসিবতে কেবল তাঁর নিকটই সাহায্য প্রার্থনা করার প্রতি দাওয়াত দেয় এবং আল্লাহ ব্যতীত নবী, আওলিয়াদের দ্বারস্থ হতে নিষেধ করে _সকল

নবীই যা করে গিয়েছেন তখনই মানুষ তার বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে যায় এবং নানা অপবাদে জর্জরিত করে ফেলে। বলে ইনি ওহাবী, রাসূলের শত্রু ইত্যাদি- যাতে মানুষ তার দাওয়াত থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়। আর কুরআনে তাওহীদের বক্তব্য সম্বলিত কোনো আয়াত আসলে তাদের কেউ কেউ বলে, এটি ওহাবীদের আয়াত। আর হাদীস যখন বলে: যখন সাহায্য চাইবে এক আল্লাহর কাছেই চাইবে, তখন কেউ কেউ বলে, এ হলো ওহাবীদের হাদীস। কোনো মুসল্লী বুকের ওপর হাত বাঁধলে, আত্তাহিয়্যাতুতে তর্জনি নাড়লে (যা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সর্বদা করতেন) বলে: এ তো ওহাবী হয়ে গেছে। আজ অবস্থাটা হয়ে গেছে এমন যে, কেউ একত্ববাদের কথা বললে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নতের অনুসরণ করলে তাকে ওহাবী বলা হয়। বিভিন্নভাবে তিরস্কার করা হয়।

৫। তাওহীদের প্রতি আহ্বানকারী দলকে অবশ্যই ধৈর্য্য ধারণ করতে হবে এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অনুসরণ করতে হবে। যাঁকে তাঁর রব বলেছেন,

﴿وَٱصۡبِرۡ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَٱهۡجُرۡهُمۡ هَجۡرٗا جَمِيلٗا ١٠﴾ [المزمل: ١٠]

অর্থাৎ তারা যা বলে তা তুমি সহ্য কর এবং তাদেরকে সুন্দরভাবে পরিত্যাগ কর। [সূরা আল-মুযযাম্মিল, আয়াত: ১০]

অন্য বলেন,

﴿فَٱصۡبِرۡ لِحُكۡمِ رَبِّكَ وَلَا تُطِعۡ مِنۡهُمۡ ءَاثِمًا أَوۡ كَفُورٗا ٢٤﴾ [الانسان: ٢٤]

"অতএব তোমার রবের হুকুমের জন্য ধৈর্য্য ধারণ কর এবং তাদের মধ্য থেকে কোনো পাপিষ্ঠ বা অস্বীকারকারীর আনুগত্য করো না"। [সূরা আদ-দাহার, আয়াত ২৪]

৬। তাওহীদের দিকে দাওয়াত দেওয়া হলে তা কবূল করা এবং দাওয়াত দানকারীকে ভালোবাসা সকল মুসলিমের ওপর ফরজ। কারণ, তাওহীদের দাওয়াত দেওয়া ছিল রাসূলদের কাজ, আমাদের রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামও এ কাজ করে গেছেন, লোকদের তাওহীদের প্রতি ডেকে গেছেন। সুতরাং যে ব্যক্তি নবীজীকে ভালোবাসবে অবশ্যই সে তাঁর দাওয়াতকে ভলবাসবে। আর যে তাওহীদকে ঘৃণা করল সে যেন নবীকেই ঘৃণা করল। কোনো মুসলিমই কি এ কাজ করতে রাযী হবে?

হুকুম-আহকাম শুধু আল্লাহ থেকে

আল্লাহ রাব্বুল আলামীন এ জগতকে সৃষ্টি করেছেন একমাত্র তাঁর ইবাদতের জন্য। আর এ ইবাদত শিক্ষা দেওয়ার জন্য পাঠিয়েছেন অসংখ্য নবী-রাসূল। তাঁদের ওপর কিতাব অবতীর্ণ করেছেন সত্য ও ন্যায়ানুগ পন্থায় মানুষদের মধ্যে বিচার করার জন্য । সুতরাং ইনসাফ ও ন্যায় বিচার পাওয়া যায় একমাত্র আল্লাহ ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হুকুমের মধ্যে। আর তাদের এ হুকুম ইবাদত, আকিদা, রাজনীতি, লেন-দেন, বেচা-কেনা, এক কথায় মানবীয় যাবতীয় কাজের ক্ষেত্রেই বিদ্যমান।

১। আকিদার ক্ষেত্রে হুকুম:

পৃথিবীতে আগত সমস্ত নবী-রাসূল সর্বপ্রথম আকিদা শুদ্ধকরণ ও মানুষদের তাওহীদের প্রতি আহ্বান কর্মসূচী দিয়ে তাদের কাজ শুরু করেছেন। লক্ষ্য করুন, ইউসুফ ‘আলাইহিস সালামকে যখন তাঁর জেলখানার সঙ্গীদ্বয় স্বপ্নের ব্যাখ্যা জিজ্ঞেস করেছিলেন তখন তিনি তাদের প্রথমে তাওহীদের দাওয়াত দিয়েছেন। এরপর তাদের প্রার্থিত বিষয়ে কথা বলেছেন। তিনি তাদের বললেন,

﴿يَٰصَٰحِبَيِ ٱلسِّجۡنِ ءَأَرۡبَابٞ مُّتَفَرِّقُونَ خَيۡرٌ أَمِ ٱللَّهُ ٱلۡوَٰحِدُ ٱلۡقَهَّارُ ٣٩ مَا تَعۡبُدُونَ مِن دُونِهِۦٓ إِلَّآ أَسۡمَآءٗ سَمَّيۡتُمُوهَآ أَنتُمۡ وَءَابَآؤُكُم مَّآ أَنزَلَ ٱللَّهُ بِهَا مِن سُلۡطَٰنٍۚ إِنِ ٱلۡحُكۡمُ إِلَّا لِلَّهِ أَمَرَ أَلَّا تَعۡبُدُوٓاْ إِلَّآ إِيَّاهُۚ ذَٰلِكَ ٱلدِّينُ ٱلۡقَيِّمُ وَلَٰكِنَّ أَكۡثَرَ ٱلنَّاسِ لَا يَعۡلَمُونَ ٤٠﴾ [يوسف: ٣٩، ٤٠]

“হে আমার কারা সঙ্গীদ্বয়, বহু সংখ্যক ভিন্ন ভিন্ন রব ভালো নাকি মহাপরাক্রমশালী এক আল্লাহ? তোমরা তাঁকে বাদ দিয়ে নিছক কতগুলো নামের ইবাদত করছ, যাদের নামকরণ তোমরা ও তোমাদের পিতৃপুরুষরা করেছ, যাদের ব্যাপারে আল্লাহ প্রমাণ নাযিল করেননি। বিধান একমাত্র আল্লাহরই। তিনি নির্দেশ দিয়েছেন যে, ‘তাঁকে ছাড়া আর করো ইবাদাত করো না। এটিই সঠিক দীন, কিন্তু অধিকাংশ লোক জানে না”। [সূরা ইউসুফ, আয়াত: ৩৯-৪০]

২। ইবাদতের ক্ষেত্রে হুকুম:

ইবাদতের যাবতীয় বিধি-বিধান কুরআন-সুন্নাহ হতে গ্রহণ করা আমাদের সকলের ওপর ওয়াজিব। যেমন, সালাত, যাকাত, হজ ও অন্যান্য ইবাদত। সবই আমাদের সম্পাদন করতে হবে কুরআনের নির্দেশ ও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নতের অনুবর্তিতায়।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

«صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي»

“তোমরা সেভাবেই সালাত আদায় কর যেভাবে আমাকে সালাত আদায় করতে দেখেছ”।[35]

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অন্যত্র বলেছেন,

«لِتَأْخُذُوا مَنَاسِكَكُمْ، فَإِنِّي لَا أَدْرِي لَعَلِّي لَا أَحُجُّ بَعْدَ حَجَّتِي هَذِهِ»

“তোমরা হজের নিয়মাবলী আমার নিকট হতে গ্রহণ কর, কেননা আমি হয়ত এ হজের পরে আর হজ করতে পারব না”।[36]

চার মাযহাবের সকল ইমামই বলেছেন, হাদীস সহীহ হলে সেটিই আমার মাযহাব।

---

[35] সহীহ বুখারী, হাদীস নং ৬৩১।

[36] সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ১২৯৭।

সুতরাং কোনো মাসআলায় তাদের মধ্যে মতভিন্নতা দেখা দিলে তাদের নির্দিষ্ট একজনের কথাই গ্রহণ করব, এমনটি নয়। বরং যার কথার পেছনে কুরআন কিংবা সহীহ হাদীসের সমর্থন পাওয়া যাবে তারটাই গ্রহণ করব।

৩। বেচা-কেনার ক্ষেত্রে হুকুম:

প্রতিটি মুসলিমের বৈষয়িক কারবার, লেন-দেন, বেচা-কনা, কর্জ দান ও গ্রহণ, ভাড়া দেওয়া-নেয়া ইত্যাদি কর্ম এক আল্লাহ ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লা-এর বিধান মত চলবে। সব ক্ষেত্রে তাদের হুকুম কার্যকর হবে।

কারণ আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বলেন,

﴿فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا۟ فِىٓ أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا۟ تَسْلِيمًا ٦٥﴾ [النساء: ٦٥]

“অতএব তোমার রবের কসম, তারা মুমিন হবে না যতক্ষণ না তাদের মধ্যে সৃষ্ট বিবাদের ব্যাপারে তোমাকে বিচারক নির্ধারণ করে, তারপর তুমি যে ফয়সালা দেবে সে ব্যাপারে নিজদের অন্তরে কোনো দ্বিধা অনুভব না করে এবং পূর্ণ সম্মতিতে মেনে নেয়”। [সূরা আন-নিসা, আয়াত: ৬৫]

তাফসীরকারকগণ এই আয়াত নাযিল হওয়ার কারণ, সম্বন্ধে বলেছেন, দুই সাহাবীর মধ্যে জমিতে পানি সেচ দেওয়া নিয়ে মতবিরোধ ঘটে। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জোবাইর রাদিয়াল্লাহু ‘আনহুকে

সেচের হুকুম দেন। তখন অন্য ব্যক্তি বলল: তার পক্ষে আপনি রায় দিয়েছেন কারণ, সে আপনার ফুফুর ছেলে। তখন এ আয়াত নাযিল হয়। (সহাহ বুখারী)

৪। বিচার ও কিসাসের ক্ষেত্রে হুকুম:

আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

﴿وَكَتَبۡنَا عَلَيۡهِمۡ فِيهَآ أَنَّ ٱلنَّفۡسَ بِٱلنَّفۡسِ وَٱلۡعَيۡنَ بِٱلۡعَيۡنِ وَٱلۡأَنفَ بِٱلۡأَنفِ وَٱلۡأُذُنَ بِٱلۡأُذُنِ وَٱلسِّنَّ بِٱلسِّنِّ وَٱلۡجُرُوحَ قِصَاصٞۚ فَمَن تَصَدَّقَ بِهِۦ فَهُوَ كَفَّارَةٞ لَّهُۥۚ وَمَن لَّمۡ يَحۡكُم بِمَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ فَأُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلظَّٰلِمُونَ ٤٥﴾ [المائدة: ٤٥]

“আর আমরা এতে তাদের ওপর অবধারিত করেছি যে, প্রাণের বিনিময়ে প্রাণ, চোখের বিনিময়ে চোখ, নাকের বিনিময়ে নাক, কানের বিনিময়ে কান ও দাঁতের বিনিময়ে দাঁত এবং জখমের বিনিময়ে সমপরিমাণ জখম। অতঃপর যে তা ক্ষমা করে দেবে, তার জন্য তা কাফ্ফারা হবে। আর আল্লাহ যা নাযিল করেছেন, তার মাধ্যমে যারা ফয়সালা করবে না,তারাই যালিম”। [সূরা আল-মায়েদা, আয়াত: ৪৫]

৫। শরী‘আতের ক্ষেত্রে এক আল্লাহর হুকুম:

আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

﴿شَرَعَ لَكُم مِّنَ ٱلدِّينِ مَا وَصَّىٰ بِهِۦ نُوحٗا وَٱلَّذِيٓ أَوۡحَيۡنَآ إِلَيۡكَ١٣﴾ [الشورى: ١٣]

“তিনি তোমাদের জন্য দীন বিধিবদ্ধ করে দিয়েছেন; যে বিষয়ে তিনি নূহকে নির্দেশ দিয়েছিলেন, আর আমরা তোমার কাছে যে ওহী পাঠিয়েছি...।” [সূরা আশ-শূরা, আয়াত: ১৩]

মুশরিকদের বক্তব্য, আল্লাহ বিচারের ভার আল্লাহ ছাড়া অন্যের হাতে দিয়েছেন। তিনি তার বিরোধিতা করে বলেন,

﴿أَمۡ لَهُمۡ شُرَكَٰٓؤُاْ شَرَعُواْ لَهُم مِّنَ ٱلدِّينِ مَا لَمۡ يَأۡذَنۢ بِهِ ٱللَّهُۚ ٢١﴾ [الشورى: ٢١]

"তাদের জন্য কি এমন কিছু শরীক আছে, যারা তাদের জন্য দীনের বিধান দিয়েছে, যার অনুমতি আল্লাহ দেন নি?" [সূরা আশ-শূরা, আয়াত: ২১]

মূল কথা:

১। প্রতিটি মুসলিমের ওপর ওয়াজিব হচ্ছে কুরআন ও সহীহ সুন্নত মুতাবেক আমল করা। পরস্পরের মাঝে কুরআন-সুন্নাহ দ্বারাই বিচার-ফয়সালা সম্পাদন কর। এক কথায় সকল ক্ষেত্রে আল্লাহর কথার ওপর আমল করা।

আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বলেন,

﴿وَأَنِ ٱحۡكُم بَيۡنَهُم بِمَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ ٤٩﴾ [المائدة: ٤٩]

"তাদের মধ্যে আল্লাহ হতে অবতীর্ণ কথায় বিচার কর"। [সূরা আল-মায়েদা, আয়াত: ৪৯]

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

«وَمَا لَمْ تَحْكُمْ أَئِمَّتُهُمْ بِكِتَابِ اللَّهِ، وَيَتَخَيَّرُوا مِمَّا أَنْزَلَ اللَّهُ، إِلَّا جَعَلَ اللَّهُ بَأْسَهُمْ بَيْنَهُمْ »

“তাদের ইমামরা আল্লাহর কিতাব ও তাঁর নাযিলকৃত বিধানাবলী দ্বারা যতক্ষণা না বিচার করবে আল্লাহ তাদের মাঝে দ্বন্দ্ব সৃষ্টি করে আযাব দিবেন”।[37]

২। উপনিবেশিক অমুসলিম শাসকরা কুরআন সুন্নাহ বিরোধী যে সব আইন করে গিয়েছিল মুসলিমরা সেসব আইন বাতিল করে কুরআন সুন্নাহর আইন প্রবর্তণ করবে এবং সে অনুযায়ী শাসন কর্ম পরিচালনা করবে। যেমন, ইংরেজ ও ফ্রান্সের শাসকরা বহু বছর যাবত আফ্রীকার বিভিন্ন দেশ শাসন করেছে এবং সে সব দেশে কুরআন সুন্নাহ বিরোধী অনেক আইনের প্রবর্তণ করেছে এখন সে সব দেশের মুসলিমদের কর্তব্য হচ্ছে আল্লাহ বিরোধী আইনগুলো পরিবর্তন করে কুরআনী আইনের প্রবর্তন করা এবং সে মতে সকল কার্য পরিচালনা করা।

৩। অমুসলিম শাসক কর্তৃক প্রবর্তিত শরী'আত বিরোধী এ সব নোংরা ও অন্যায় আইন পরিবর্তন করে ইসলামী হুকুমত প্রতিষ্ঠা করা অবধি মুসলিমদের সম্মান ও মর্যাদা প্রতিষ্ঠিত হবে না এবং তারা কোনো প্রকার সাহায্যও পাবে না। তাদের প্রতি আল্লাহর সাহায্য তখনই আসবে জীবনের প্রতিটি পর্বে যখন তারা আল্লাহর দেওয়া শরী'আতকে পূর্ণভাবে প্রতিষ্ঠা করবে। আল্লাহ প্রদত্ত ন্যায়-নায্য বিচারকে গ্রহণ করবে এবং আল্লাহর বান্দাদের জন্য ন্যায় ও ইনসাফপূর্ণ সমাজ প্রতিষ্ঠা করবে।

---

[37] ইবন মাজাহ, হাদীস নং ৪০১৯, আলবানী রহ. হাদীসটিকে হাসান বলেছেন।

আক্বীদা আগে না হুকুমত আগে?

মক্কা মোকাররমার প্রসিদ্ধ দারুল হাদীসে এক আলোচনায় বিশ্ব বরেণ্য ইসলামী চিন্তাবিদ প্রখ্যাত শাইখ মুহাম্মাদ কুতুব অতি গুরুত্বপূর্ণ এ প্রশ্নটির জবাব দিয়েছিলেন, আমরা এখানে সে উত্তরটি সম্মনীত পাঠক সমীপে উপস্থাপন করছি।

তাকে প্রশ্ন করা হয়েছিল: বর্তমানে কিছু লোক বলে থাকেন, ইসলামী হুকুমত প্রতিষ্ঠিত হলে ইসলাম পুনরুজ্জীবিত হত। আবার অন্যেরা বলেন, ইসলাম আবারো তাজা হবে যদি আক্বীদাকে সহীহ করার মেহনত করা হয় এবং জামা'আত সুসংগঠিত করা হয়। এর কোনটা সত্য?

উত্তরে তিনি উল্টা প্রশ্ন করে বলেছিলেন: দুনিয়ার বুকে ইসলামী হুকুমত কায়েম হবে কোত্থেকে যদি না দায়ীরা মানুষের আক্বীদা সংশোধন করেন, সত্যিকারের ঈমানের প্রশিক্ষণ দান করেন, দীনের ব্যাপারে পরীক্ষা করা হলে সবর করেন এবং আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করেন? উপরোক্ত বিষয়গুলোর পূর্ণতার পরই দুনিয়ায় দীন মোতাবেক শাসন প্রতিষ্ঠা হবে। এটাতো খুবই পরিস্কার ব্যাপার। হুকুমত কখনই আকাশ থেকে অবতীর্ণ হবে না, কেউ তা অবতীর্ণ করাতেও পারবে না। হ্যাঁ সকল জিনিসই আকাস থেকে আসে, কিন্তু তা আসে ত্যাগ তিতিক্ষা ও কষ্ট-মেহনতের মাধ্যমে। এর জন্য আল্লাহ বান্দাদের ওপর মেহনত ফরয করে দিয়েছেন।

﴿وَلَوۡ يَشَآءُ ٱللَّهُ لَٱنتَصَرَ مِنۡهُمۡ وَلَٰكِن لِّيَبۡلُوَاْ بَعۡضَكُم بِبَعۡضٍۗ ٤﴾ [محمد: ٤]

“আর আল্লাহ ইচ্ছা করলে তাদের কাছ থেকে প্রতিশোধ গ্রহণ করতে পারতেন, কিন্তু তোমাদের একজনকে অন্যের দ্বারা পরীক্ষা করতে চান”। [সূরা মুহাম্মাদ, আয়াত: ৪]

তাই আমাদের শুরু করতে হবে আক্বীদা সহীহ করার মাধ্যমে এবং এ সমাজকে গঠন করে তুলতে হবে সত্যিকারের আক্বীদার ওপর। যারা মেহনত শুরু করবে তারা অবশ্যই পরীক্ষার সম্মুখীন হবে, তাদেরকে সে পরীক্ষার ওপর সবর করতে হবে। যেমনটি সবর করেছিলেন প্রথম যামানায় সাহাবায়ে কেরাম।

বড় শির্ক ও তার শ্রেণিবিভাগ

বড় শির্কের অর্থ হচ্ছে, আক্বীদা-বিশ্বাস, কথা-বক্তব্য কিংবা আমল-আচরণের মাধ্যমে কাউকে আল্লাহর সমকক্ষ বানানো। আল্লাহকে যেভাবে ডাকা হয় তাকে তেমনিভাবে ডাকা। তার জন্য কোনো ইবাদত নির্দিষ্ট করা হয়। যেমন, সাহায্য প্রার্থনা, জবেহ, নজর-নেয়াজ, মানত প্রভৃতি।

সহিহ বুখারি ও মুসলিমে আব্দুল্লাহ ইবন মাসউদ রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণিত হয়েছে, তিনি বলেন,

«أَيُّ الذَّنْبِ أَعْظَمُ عِنْدَ اللَّهِ؟ قَالَ: «أَنْ تَجْعَلَ لِلَّهِ نِدًّا وَهُوَ خَلَقَكَ»

“আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে প্রশ্ন করলাম: সবচেয়ে বড় গুনাহ কী? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন,

তোমার পক্ষে আল্লাহর কোনো সমকক্ষ নির্ধারণ করা, অথচ তিনি তোমায় সৃষ্টি করেছেন”।[38]

[38] সহীহ বুখারী, হাদীস নং ৪৪৭৭, সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ৮৬।

বড় শির্কের বিশেষ বিশেষ প্রকাশ

১। দো'আর মধ্যে শির্ক:

অর্থাৎ আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো কাছে দো'আ করা, কোনো কিছু ঝাঞ্ছা করা। যেমন, নবী কিংবা আউলিয়াদের কাছে, রিযিক বৃদ্ধি, রোগ মুক্তি, অভাব দূরীকরণ ইত্যাদির জন্য দো'আ করা।

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿وَلَا تَدۡعُ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَا لَا يَنفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَۖ فَإِن فَعَلۡتَ فَإِنَّكَ إِذٗا مِّنَ ٱلظَّٰلِمِينَ ١٠٦﴾ [يونس: ١٠٦]

"আর আল্লাহ ছাড়া এমন কিছুকে ডেকো না, যা তোমার উপকার করতে পারে না এবং তোমার ক্ষতিও করতে পারে না। যদি তুমি (এমনটি) কর, তাহলে নিশ্চয় তুমি জালিমদের অন্তর্ভুক্ত হবে"। [সূরা ইউনুস, আয়াত: ১০৬]

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

«مَنْ مَاتَ وَهْوَ يَدْعُو مِنْ دُونِ اللَّهِ نِدًّا دَخَلَ النَّارَ»

"যে ব্যক্তি এমতাবস্থায় মারা যাবে যে আল্লাহ ছাড়া অন্যকে সমকক্ষ হিসাবে ডেকেছে, তাহলে সে (জাহান্নামের) আগুনে প্রবেশ করবে"।[39]

আল্লাহ ছাড়া অন্যের কাছে দো'আ করা শির্ক। যেমন, মৃত ও আউলিয়াদের কাছে দো'আ করা। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

---

[39] সহীহ বুখারী, হাদীস নং ৪৪৯৭।

﴿وَٱلَّذِينَ تَدۡعُونَ مِن دُونِهِۦ مَا يَمۡلِكُونَ مِن قِطۡمِيرٍ ١٣ إِن تَدۡعُوهُمۡ لَا يَسۡمَعُواْ دُعَآءَكُمۡ وَلَوۡ سَمِعُواْ مَا ٱسۡتَجَابُواْ لَكُمۡۖ وَيَوۡمَ ٱلۡقِيَٰمَةِ يَكۡفُرُونَ بِشِرۡكِكُمۡۚ وَلَا يُنَبِّئُكَ مِثۡلُ خَبِيرٖ ١٤﴾ [فاطر: ١٣، ١٤]

"তোমরা আল্লাহকে ছেড়ে যাদেরকে ডাকছ তারা খেজুরের আটির আবরণেরও মালিক নয়। যদি তোমরা তাদেরকে ডাকো, তারা তোমাদের ডাক শুনবে না; আর শুনতে পেলেও তোমাদের ডাকে সাড়া দেবে না। আর কেয়ামতের দিন তারা তোমাদের শরীক করাকে অস্বীকার করবে। আর সর্বজ্ঞ আল্লাহর ন্যায় কেউ তোমাকে অবহিত করবে না"। [সূরা ফাতির, আয়াত: ১৩-১৪]

২। আল্লাহর গুণের ক্ষেত্রে শির্ক:

যেমন, আম্বিয়া কিংবা আওলিয়াগণ গায়েব জানেন মর্মে বিশ্বাস করা।

আল্লাহ বলেন,

﴿وَعِندَهُۥ مَفَاتِحُ ٱلۡغَيۡبِ لَا يَعۡلَمُهَآ إِلَّا هُوَۚ ٥٩﴾ [الانعام: ٥٩]

"এবং তাঁর নিকটেই গায়েবের চাবিকাঠিসমূহ, তিনি ছাড়া কেউই তা জানে না"। [সূরা আল-আন'আম, আয়াত: ৫৯]

৩। মহব্বতের ক্ষেত্রে শির্ক:

আল্লাহকে ভালোবাসার মতো কোনো ওলীকে ভালোবাসা।

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ ٱللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ ٱللَّهِۖ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَشَدُّ حُبًّا لِّلَّهِۗ ١٦٥﴾ [البقرة: ١٦٥]

"আর মানুষের মধ্যে এমনও আছে, যারা আল্লাহ ছাড়া অন্যকে আল্লাহর সমকক্ষরূপে গ্রহণ করে, তাদেরকে আল্লাহকে ভালোবাসার মত ভালোবাসে। আর যারা ঈমান এনেছে, তারা আল্লঅহর জন্য ভালোবাসায় দৃঢ়তর"। [সূরা আল-বাকারা, আয়াত: ১৬৫]

৪। আনুগত্যের ক্ষেত্রে শির্ক:

যেমন, পাপের ক্ষেত্রে কোনো আলিম অথবা কোনো পীরের আনুগত্য করা , এই ধারণায় যে তারা ঠিকই করছে।

আল্লাহ বলেন,

﴿ٱتَّخَذُوٓاْ أَحۡبَارَهُمۡ وَرُهۡبَٰنَهُمۡ أَرۡبَابًا مِّن دُونِ ٱللَّهِ ٣١﴾ [التوبة: ٣١]

"তারা (খৃষ্টানরা) আল্লাহকে ছেড়ে তাদের আলিম ও আবেদদেরকে রব হিসেবে গ্রহণ করেছে"। [সূরা আত-তাওবাহ, আয়াত: ৩১]

এ আনুগত্যের ব্যাখ্যা হলো, তারা পাপের ক্ষেত্রেও তাদের আনুগত্য করত, যেমন আল্লাহ তা'আলার নির্দেশিত হালালকে হারাম এবং হারামকে হালাল জ্ঞান করত।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

«لَا طَاعَةَ لِمَخْلُوقٍ فِي مَعْصِيَةِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ»

“স্রষ্টার অবাধ্যতার কাজে সৃষ্টির আনুগত্য করা যাবে না”।[40]

৫। হুলুলের ক্ষেত্রে শির্ক:

অর্থাৎ এমন ধারণা পোষণ করা যে, আল্লাহ রাব্বুল আলামীন তাঁর সৃষ্টির মধ্যে অবস্থান করছেন। তাদের মাঝে দ্রবীভূত হয়ে গেছেন। এটা অনেক সূফি-পীরদের ধারণা। যেমন, ইবন আরাবী বলেন, রবই দাস আর দাসই রব। হায়... তাহলে সালাত, সিয়ামের দ্বারা কি লাভ হবে? অন্য একজন বলেছেন, কুকুর শুকরও আল্লাহ ছাড়া কিছু না। মন্দিরের ঋষিও আল্লাহ। (নাউযুবিল্লাহ)।

৬। দুনিয়া নিয়ন্ত্রণ-পরিচালনার ক্ষেত্রে শির্ক:

এমন বিশ্বাস পোষণ করা যে, আল্লাহর এমন অনেক ওলী আছেন যারা এ সৃষ্টিজগতকে নিয়ন্ত্রণ ও পরিচালনা করেন। তাদেরকে কুতুব বলা হয়। অথচ আল্লাহ তা‘আলা পূর্বেকার মুশরিকদের প্রশ্ন করেছিলেন:

﴿وَمَن يُدَبِّرُ ٱلۡأَمۡرَۚ فَسَيَقُولُونَ ٱللَّهُۚ ٣١﴾ [يونس: ٣١]

“(যদি প্রশ্ন কর) কে সব বিষয় পরিচালনা করেন? তখন তারা অবশ্যই বলবে, আল্লাহ”। [সূরা ইউনুস, আয়াত: ৩১]

---

[40] মুসনাদ আহমদ, হাদীস নং ১০৯৪, শুয়াইব আরনাউত হাদীসটিকে বুখারী ও মুসলিমের শর্তে সহীহ বলেছেন।

৭। শাসন ও বিচার- ফয়সালার ক্ষেত্রে শির্ক:

যেমন, ইসলাম বিরোধী আইন প্রনয়ণ ও তাকে জায়েয মনে করা। অথবা এমন ধারণা পোষণ করা যে, বর্তমান যুগে ইসলামী আইন চলতে পারে না। এ ক্ষেত্রে আইন প্রণেতা-রাজা এবং গ্রহীতা-প্রজা উভয়েই অন্তর্ভুক্ত।

বড় শির্ক সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির পূর্বেকৃত সকল নেক আমল নষ্ট করে দেয়

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ ٱلْخَٰسِرِينَ ۝٦٥﴾ [الزمر: ٦٤]

"অবশ্যই আমি তোমার কাছে এবং যারা (নবীরা) তোমার পূর্বে ছিল তাদের কাছে এ মর্মে ওহী পাঠিয়েছি যে, যদি শির্ক কর তাহলে অবশ্যই তোমার আমল নষ্ট হয়ে যাবে এবং অবশ্যই তুমি ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভূক্ত হবে"। [সূরা আয-যুমার, আয়াত: ৬৪]

বড় শির্ক আল্লাহ তা'আলা তওবা ছাড়া মাফ করেন না

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِۦ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَٰلِكَ لِمَن يَشَآءُۚ وَمَن يُشْرِكْ بِٱللَّهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَٰلَۢا بَعِيدًا ۝١١٦﴾ [النساء: ١١٦]

“নিশ্চয় আল্লাহ ক্ষমা করেন না তাঁর সাথে শির্ক করাকে এবং এ ছাড়া যাকে চান ক্ষমা করেন। আর যে আল্লাহর সাথে শির্ক করে সে তো ঘোর পথভ্রষ্টতায় পথভ্রষ্ট হলো”। [সূরা আন-নিসা, আয়াত: ১১৬]

শির্কের অনেক শ্রেণিবিভাগ আছে। তার মাঝে কোনোটা বড় আবার কোনোটা ছোট। সকলের ওপর ওয়াজিব হলো, সর্ব প্রকার শির্ক হতে সাবধান থাকা। আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে এই দো‘আ শিখিয়েছেন:

«اللهُمَّ إِنَّا نَعُوذُ بِكَ مِنْ أَنْ نُشْرِكَ بِكَ شَيْئًا نَعْلَمُهُ، وَنَسْتَغْفِرُكَ لِمَا لَا نَعْلَمُ»

“হে আল্লাহ! আমরা তোমার কাছে জেনে- বুঝে শির্ক করা হতে পানাহ চাই এবং অজানা শির্ক হতে ক্ষমা চাই”। [41]

আল্লাহকে ছেড়ে যারা অন্যকে ডাকে তাদের দৃষ্টান্ত

﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ضُرِبَ مَثَلٞ فَٱسۡتَمِعُواْ لَهُۥٓۚ إِنَّ ٱلَّذِينَ تَدۡعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ لَن يَخۡلُقُواْ ذُبَابٗا وَلَوِ ٱجۡتَمَعُواْ لَهُۥۖ وَإِن يَسۡلُبۡهُمُ ٱلذُّبَابُ شَيۡـٔٗا لَّا يَسۡتَنقِذُوهُ مِنۡهُۚ ضَعُفَ ٱلطَّالِبُ وَٱلۡمَطۡلُوبُ ٧٣﴾ [الحج: ٧٣]

“হে মানুষ, একটি উপমা পেশ করা হলো, মনোযোগ দিয়ে তা শোন, তোমরা আল্লাহর পরিবর্তে যাদেরকে ডাক তারা কখনো একটি মাছিও সৃষ্টি করতে পারবে না। যদিও তারা এ উদ্দেশ্যে একত্রিত হয়। আর যদি মাছি তাদের কাছ থেকে কিছু ছিনিয়ে নেয়, তারা তার কাছ থেকে

[41] মুসনাদ আহমদ, হাদীস নং ১৯৬০৬, শুয়াইব আরনাউত বলেছেন, সনদটি দ‘য়ীফ।

তাও উদ্ধার করতে পারবে না। অন্বেষণকারী ও যার কাছে অন্বেষণ করা হয় উভয়েই দুর্বল”। [সূরা আল-হজ, আয়াত: ৭৩]

এই আয়াতে আল্লাহ তা‘আলা সমস্ত মানুষদের সম্বোধন করে বলেছেন, যে সব ওলীআল্লাহ বা নেককার ব্যক্তিদেরকে তোমরা তাদের মৃত্যুর পর তোমাদের সাহায্য করার জন্য ডাকছো, কক্ষণোই তারা তা করতে সমর্থ হবে না। আর যদি কোনো মাছি তাদের খাদ্য দ্রব্য বা পানীয় ছিনিয়ে নিয়ে যায় তারা তা তাদের কাছ থেকে ফিরিয়ে আনতে পারবে না। এটা তাদের দুর্বলতার প্রমাণ এবং মাছিরও দুর্বলতা । তাহলে কেমন করে-কোন যুক্তিতে তোমরা আল্লাহকে ছেড়ে তাদেরকে ডাক? যারা আল্লাহকে কোনো নবী বা ওলীদের ডাকে এ উপমা তাদের জন্য। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন তাদেরকে এ অসার কাজ হতে প্রচন্ডভাবে নিষেধ করেছেন।

২। আল্লাহ বলেন,

﴿لَهُۥ دَعۡوَةُ ٱلۡحَقِّۚ وَٱلَّذِينَ يَدۡعُونَ مِن دُونِهِۦ لَا يَسۡتَجِيبُونَ لَهُم بِشَيۡءٍ إِلَّا كَبَٰسِطِ كَفَّيۡهِ إِلَى ٱلۡمَآءِ لِيَبۡلُغَ فَاهُ وَمَا هُوَ بِبَٰلِغِهِۦۚ وَمَا دُعَآءُ ٱلۡكَٰفِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَٰلٖ ١٤﴾ [الرعد: ١٤]

“সত্যের আহ্বান তাঁরই, আর যারা তাকে ছাড়া অন্যদেরকে ডাকে, তারা তাদের ডাকে সামান্যও সাড়া দিতে পারে না, বরং (তাদের দৃষ্টান্ত) ঐ ব্যক্তির মত, যে পানির দিকে তার দু’হাত বাড়িয়ে দেয় যেন তা তার মুখে পৌঁছে অথচ তা তার কাছে পৌঁছবার নয়। আর কাফিরদের ডাক তো শুধু ভ্রষ্টতায় পর্যবসিত হয়”। [সূরা আর-রা‘আদ, আয়াত: ১৪]

উপরোক্ত আয়াত থেকে আমরা এই শিক্ষাই পাই যে, দো‘আ হলো ইবাদত। তা কেবল আল্লাহর জন্য নির্দিষ্ট। যারা আল্লাহকে ছেড়ে অন্যকে ডাকছে, তাদের কাছ থেকে তারা কোনো উপকার পায় না এবং কোনো ব্যাপারেই তারা তাদের উত্তর দেওয়ার ক্ষমতা রাখে না। এ উদাহরণ হুবহু সে ব্যক্তির মত, যে হাত দিয়ে পানি পান করার জন্য কূপের পাড়ে হাত বাড়িয়ে দাঁড়িয়ে আছে, অথচ হাত দ্বারা কখনই তার নাগাল পাওয়া যাবে না।

মুজাহিদ রহ. বলেন, মুখের সাহায্যে পানিকে ডাকছে ও তার দিকে ইশারা করছে, কিন্তু তা কখনোই তার কাছে আসবে না। (ইবন কাসীর)

যারা আল্লাহ ব্যতীত অন্যদেরকে ডাকে তিনি তাদেরকে কাফির বলে আখ্যায়িত করেছেন এবং বলেছেন যে, তাদের দো‘আ ও ডাকা ডাকি ব্যর্থতায় পর্যবসিত।

সুতরাং হে আমার মুসলিম ভাই! আল্লহকে ছেড়ে অন্যের কাছে দো‘আ করা হতে সাবধান হোন। এর ফলে কাফির ও পথভ্রষ্ট হয়ে যাবেন। একমাত্র আল্লাহকে ডাকুন, যিনি সর্বময় কর্তা ও সকল ক্ষমতার মালিক। এতে করে আপনি খাঁটি মুমিন ও একত্ববাদীদের অন্তর্ভূক্ত হতে পারবেন।

আল্লাহর সাথে শির্ক করা-এ মহা ক্ষতিকর পাপ হতে আমরা পরিত্রাণ পেতে পারি কীভাবে?

তিন প্রকারের শির্ক হতে মুক্ত হওয়া অবধি আল্লাহর সাথে শির্ক করা হতে পরিত্রাণের কোনো উপায় নেই।

১। রুবুবিয়াতের ক্ষেত্রে শির্ক:

অর্থাৎ পৃথিবী পরিচালানার ক্ষেত্রে আল্লাহ তা‘আলার সাথে অন্য স্রষ্টা ও পরিচালক আছে মর্মে বিশ্বাস পোষণ করা। যেমন, কতিপয় পীর মনে করে থাকে যে, আল্লাহ তা‘আলা পৃথিবীর কিছু কাজ বিভিন্ন ওলীদের দায়িত্বে ন্যাস্ত করে থাকেন। সে সব কাজ তারাই নির্বাহ করে। এমন অবান্তর ধারণা ইসলামের পূর্বের মুশরিকরা পর্যন্ত করে নি। পবিত্র কুরআনে বর্ণিত হয়েছে,

﴿وَمَن يُدَبِّرُ ٱلۡأَمۡرَۚ فَسَيَقُولُونَ ٱللَّهُۚ ٣١﴾ [يونس: ٣١]

“(যদি প্রশ্ন কর) কে সব বিষয় পরিচালনা করেন? তখন তারা অবশ্যই বলবে, আল্লাহ”। [সূরা ইউনুস, আয়াত: ৩১]

লেখক বলেন, আমি এক সূফি সম্পর্কে শুনেছি সে বলে যে, আল্লাহর এমন বান্দাও আছে যদি সে বলে, হও সাথে সাথে তা হয়ে যায়।

অথচ পবিত্র কুরআন বলে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন এ গুণ কেবল তাঁর জন্য নির্দিষ্ট করেছেন। আল্লাহ বলেন,

﴿إِنَّمَآ أَمۡرُهُۥٓ إِذَآ أَرَادَ شَيۡـًٔا أَن يَقُولَ لَهُۥ كُن فَيَكُونُ ٨٢﴾ [يس: ٨٢]

“তাঁর ব্যাপার শুধু এই যে, কোন কিছুকে তিনি যদি হও বলতে চান, তখনই তা হয়ে যায়”। [সূরা ইয়াসীন, আয়াত: ৮২]

আল্লাহ তা‘আলা আরো বলেন,

﴿أَلَا لَهُ ٱلۡخَلۡقُ وَٱلۡأَمۡرُۗ ٥٤﴾ [الاعراف: ٥٣]

“শুনে রাখ! সৃষ্টি এবং হুকুম তাঁরই (জন্য নির্ধারিত)”। [সূরা আল-আ‘রাফ, আয়াত: ৫৪]

২। ইবাদতের ক্ষেত্রে শির্ক:

অর্থাৎ আল্লাহর সাথে অন্যের ইবাদত-আনুগত্য করা। যেমন, নবী ও নেককার বান্দাদের ইবাদত করা। তাদের ওসিলায় বিপদমুক্তি প্রার্থনা করা। বিপদের সময় তাদের কাছে দো‘আ করা এবং এ জাতীয় বিভিন্ন কাজ। যেমন এভাবে বলা যে, হে আল্লাহর রাসূল! সাহায্য করুন, হে আব্দুল কাদের জিলানী! সাহায্য করুন। আর এ সাহায্য প্রার্থনাটাই ইবাদত। কারণ, এটি সরাসরি দো‘আ। আর হাদীসে এসেছে, দো‘আই ইবাদত। বড়ই অনুতাপের বিষয়, বর্তমানে এ সব বিষয় এ উম্মতের মধ্যে নানাভাবে বিরাজমান। এক ধরনের বাতেল পীর সমাজে এ সব বিষয়ের প্রচলন ঘটিয়েছে এবং নানা কৌশলে এর ব্যাপক প্রসার ঘটাচ্ছে। দিন দিন নানা মানুষ এ বিভ্রান্তি ও শির্কী কাজে নিপতিত হচ্ছে নতুন করে। যে সব ভন্ড পীর শরী‘আত পরিপন্থী এসব শির্কী কাজ সমাজে ছড়িয়েছে, বলার অপেক্ষা রাখে না, সাধারণ বিভ্রান্ত মানুষের পাপের বোঝাও তাদেরকে বহন করতে হবে। ওসীলা খোঁজার নাম করে এ সব শির্কী প্রচারণা চালানো হচ্ছে। অথচ ওসীলার অর্থ হলো কোনো মাধ্যমকে কাজে লাগিয়ে আল্লাহর কাছে কিছু প্রার্থনা করা। নেক আমলকে ওসিলা করে আল্লাহর নিকট প্রার্থনা করার বিষয়টি শরী‘আত অনুমোদিত; কিন্তু কোনো মৃত ব্যক্তিকে ওসিলা হিসাবে দাঁড় করানো অবৈধ।

৩। আল্লাহর গুণের ক্ষেত্রে শির্ক:

অর্থাৎ আল্লাহর কোনো সৃষ্টিকে সে সব গুণে ভূষিত করা যা শুধু তাঁরই জন্য নির্দিষ্ট। যেমন গায়েব এর ইলম। অদৃশ্য বা গায়েব-এর ইলম শুধুমাত্র আল্লাহর জন্য নির্দিষ্ট। এ সম্বন্ধে কুরআনে বহু আয়াত বিদ্যমান। কিন্তু অনেক লোক প্রচার করে থাকে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামও গায়েব জানেন। এসব প্রচারণার কাজে অনেক বাতেল পীর ও তাদের ভক্তবৃন্দ জড়িত।

যেমন বুছাইরী, সে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রশংসায় বলেছে: হে নবী (সা.) তোমার দয়াতেই এই দুনিয়ার ভালো, আর মন্দও তোমা হতে। তোমার ইলম হতেই কলম ও লওহে মাহফুজের ইলম।

এ প্রচারণা থেকেই পথভ্রষ্ট চরম মিথ্যাবাদীদের কথা সম্মুখে এসেছে, যারা ধারণা পোষণ করে যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে তারা জাগ্রত অবস্থায় দেখতে পায় এবং তাদের অজানা নানা গোপন বিষয়ে তাঁকে প্রশ্ন করে। যাদের তারা ভালোবাসে তাঁর কাছে তাদের গোপন বিষয়ে জানতে চায় এবং তাদের কাজে হস্তক্ষেপ করতে চায়। এমনকি এমন সব কথাও, যা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জীবিত অবস্থায়ও জানতেন না।

অথচ পবিত্র কুরআন বলে:

﴿وَلَوۡ كُنتُ أَعۡلَمُ ٱلۡغَيۡبَ لَٱسۡتَكۡثَرۡتُ مِنَ ٱلۡخَيۡرِ وَمَا مَسَّنِيَ ٱلسُّوٓءُۚ ١٨٨﴾ [الاعراف: ١٨٧]

“যদি আমি গায়েব জানতাম তাহলে অধিক কল্যাণ লাভ করতাম এবং আমাকে কোনো ক্ষতি স্পর্শ করত না”। [সূরা আল-আ‘রাফ, আয়াত: ১৮৮]

আর এটি কীভাবে সম্ভব যে, তিনি তাঁর মৃত্যুর পর যখন উপরের বন্ধুর কাছে চলে গেছেন সেসব গায়েব সম্বন্ধে জানেন?

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একদিন একটা বাচ্চা মেয়েকে শুনতে পেলেন, সে বলছে, আমাদের মধ্যে এমন নবী আছেন যিনি আগামীকালের কথা জানেন। তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে বললেন: না, এ কথা বলো না। সেগুলোই বলো, যা এতক্ষণ বলছিলে । (সহীহ বুখারী)

প্রকৃত একত্ববাদী কে?

যে ব্যক্তি আল্লাহর একত্ববাদের মধ্যে উপরোক্ত তিন ধরণের শির্ককে মিশ্রিত করে না। তাঁর সত্তা, ইবাদত, দো‘আ এবং যাবতীয় গুণাবলীর ক্ষেত্রে তাঁকে একক বলে মান্য করে, সেই হচ্ছে প্রকৃত একত্ববাদী। যে ব্যক্তি এ শির্কত্রয়ীর কোনোটিকে স্বীকার করে, সে আর একত্ববাদী থাকে না, বরং তার ক্ষেত্রে আল্লাহ তা‘আলার নিম্নোক্ত বাণী প্রযোজ্য হবে,

﴿لَئِنۡ أَشۡرَكۡتَ لَيَحۡبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ ٱلۡخَٰسِرِينَ ٦٥﴾ [الزمر: ٦٤]

“যদি তুমি শির্ক কর তাহলে তোমার আমল নষ্ট হয়ে যাবে এবং তুমি অবশ্যই ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবে”। [সূরা আয-যুমার, আয়াত: ৬৫]।

ছোট শির্ক ও তার শ্রেণিবিভাগ

ছোট শির্ক বলতে সে সব কাজ ও পদ্ধতিকে বলা হয় যা মানুষকে বড় শির্কের নিকটবর্তী করে দেয়। তবে ইবাদতের স্তর পর্যন্ত পৌঁছে না। তাই সেগুলো সম্পাদনকারীকে দীন-ইসলাম থেকে বের করে না। তবে কবীরা গুনাহের অন্তর্ভূক্ত। যেমন,

১- রিয়া যা লোক দেখানো আমল।

প্রতিটি ইবাদতকারী যাবতীয় নেক কাজ আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যেই সম্পাদন করে থাকে। তাঁর জন্যই সালাত, সিয়াম, হজ প্রভৃতি আদায় করে থাকে। কিন্তু আল্লাহর সন্তুষ্টির চিন্তা বাদ দিয়ে মানুষের প্রশংসা কুড়ানোর উদ্দেশ্যে এসব নেক আমল সম্পাদন করাকে রিয়া বলে।

আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

﴿فَمَن كَانَ يَرۡجُواْ لِقَآءَ رَبِّهِۦ فَلۡيَعۡمَلۡ عَمَلٗا صَٰلِحٗا وَلَا يُشۡرِكۡ بِعِبَادَةِ رَبِّهِۦٓ أَحَدَۢا ١١٠﴾ [الكهف: ١١٠]

“সুতরাং যে তার রবের সাক্ষাৎ কামনা করে, সে যেন সৎকর্ম করে এবং তার রবের ইবাদতে কাউকে শরীক না করে”। [সূরা আল-কাহাফ, আয়াত: ১১০]

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

«إِنَّ أَخْوَفَ مَا أَخَافُ عَلَيْكُمُ الشِّرْكُ الْأَصْغَرُ " قَالُوا: وَمَا الشِّرْكُ الْأَصْغَرُ يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: " الرِّيَاءُ، يَقُولُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ: إِذَا جُزِيَ النَّاسُ بِأَعْمَالِهِمْ: اذْهَبُوا إِلَى الَّذِينَ كُنْتُمْ تُرَاءُونَ فِي الدُّنْيَا فَانْظُرُوا هَلْ تَجِدُونَ عِنْدَهُمْ جَزَاءً»

“তোমাদের জন্য যে জিনিসকে আমি সবচেয়ে বেশি আশঙ্কা করি তা হলো ছোট শির্ক, রিয়া। কিয়ামত দিবসে যখন মানুষকে তাদের আমলের বদলা দেওয়া হবে তখন আল্লাহ বলবেন: সে সব লোকদের নিকট যাও যাদেরকে দেখিয়ে আমল করেছিলে, দেখ তাদের কাছে কোনো বদলা পাও কি না”। [42]

২। আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো নামে কসম খাওয়া

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

---

[42] মুসনাদ আহমদ, হাদীস নং ২৩৬৩০, আল্লামা শুয়াইব আরনাউত হাদীসটিকে হাসান বলেছেন।

«مَنْ حَلَفَ بِغَيْرِ اللهِ فَقَدْ أَشْرَكَ»

“যে আল্লাহ ছাড়া অন্য কারও নামে শপথ করল, সে শির্ক করল।[43]

৩। গোপন শির্ক

ইবন আব্বাস রাদিয়াল্লাহু ‘আনহুমা-এর ব্যাখ্যা দিয়েছেন, কোনো ব্যক্তির অপর ব্যক্তিকে উদ্দেশ্য করে বলা যে, (আল্লাহ যা চান এবং তুমি যা চাও) অথবা (যদি আল্লাহ না থকত এবং অমুক না থাকত) আল্লাহর চাওয়া ও সাথিত্বকে মানুষের চাওয়া ও সাথিত্বের সাথে মিলিয়ে দেওয়া। তবে এসব ক্ষেত্রে এভাবে বলা যায় যে, যদি আল্লাহ না থাকত তারপর তুমি না থাকতে।

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

«لَا تَقُولُوا مَا شَاءَ اللهُ وَشَاءَ فُلَانٌ، وَلَكِنْ قُولُوا: مَا شَاءَ اللهُ ثُمَّ شَاءَ فُلَانٌ »

“তোমরা এভাবে বল না, যা আল্লাহ চান এবং অমুকে চায়। বরং এভাবে বল: যা আল্লাহ চান তারপর অমুকে চায়”।[44]

শির্কের বাহ্যিক প্রকাশ:

ইসলামী রাষ্ট্রগুলোতে মুসলিমরা আজ যে কষ্ট ও মুসিবতে জর্জরিত তার অন্যতম প্রধান কারণ, হলো, তাদের মধ্যে প্রকাশ্যভাবে ও ব্যাপকহারে

---

[43] মুসনাদ আহমদ, হাদীস নং ৫৩৭৫, আল্লামা শুয়াইব আরনাউত হাদীসটির সনদকে দ‘য়ীফ বলেছেন।

[44] মুসনাদ আহমদ, হাদীস নং২৩৩৪৭, আল্লামা শুয়াইব আরনাউত হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন।

শির্ক ছড়িয়ে পড়েছে। তারা যে আজ ফিৎনা-ফাসাদ, যুদ্ধ-বিগ্রহ এবং ভূমিকম্প, ঘূর্ণিঝড় ও জলোচ্ছ্বাসের মতো প্রাকৃতিক দুর্যোগের সম্মুখীন হচ্ছে, তা আল্লাহ তা'আলাই তাদের ওপর গজব হিসাবে নাযিল করেছেন। তার কারণ, তারা তাওহীদ বিমুখ হয়ে পড়েছে। তাদের আকিদাহ ও কাজে-কর্মে শির্ক প্রকাশ পাচ্ছে। অধিকাংশ মুসলিম দেশেই এ অবস্থা বিরাজ করছে। শির্ককে উৎখাত করার জন্যই ইসলামের আবির্ভাব এ কথা মুসলিম সমাজ জানলেও কোনটি শির্ক তা না জানার কারণে সেসব শির্কী কাজকেই সাওয়াবের কাজ মনে করে আমল করে যাচ্ছে। তাই তারা এসব প্রচলিত শির্কের বিরুদ্ধে কোনো প্রতিবাদ করে না।

শির্কের বিশেষ বিশেষ প্রকাশ

১। আল্লাহ ব্যতীত অন্যের কাছে প্রার্থনা করা

এ বিষয়টি সাধারণত: মীলাদুন্নবী ও এ জাতীয় অনুষ্ঠানাদিতে নৃত্য-গীত ও কবিতা- কাওয়ালির মাধ্যমে প্রকাশ পায়। (লেখক বলেন) আমি একবার কাউকে বলতে শুনেছিলাম, হে রাসূলদের ইমাম! হে আমার নেতা! আপনি আল্লাহ তা'আলার দরজা এবং দুনিয়া ও আখিরাতে আমার ভরসাস্থল। হে আল্লাহর রাসূল! আমাকে নিজ হাতে ধরে নিন। আমার বিপদ দুর করে সু-দিন আনতে আপনি ছাড়া আর কেউ পারবে না। আবার কেউ কেউ বলে, হে সমস্ত হযরতদের মাথার মুকুট, ইত্যাদি। যদি আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এসব কথা নিজে শুনতেন, তাহলে অবশ্যই নিজেকে তা থেকে মুক্ত বলে ঘোষণা

করতেন। কারণ, দুর্দিনকে সু-দিনে পরিণত করতে আল্লাহ ছাড়া কেউ পারে না। দৈনিক সংবাদপত্র, মাসিক ম্যাগাজিন, এমনকি বই-পুস্তকেও এ জাতীয় অনেক কবিতা-গজল-কাওয়ালি লিখে প্রচার করা হয়। আল্লাহ ব্যতীত অন্যের কাছে প্রার্থনা করার বিষয়টি যেমন, রাসূলুল্লাহ, বিভিন্ন ওলী-আওলিয়া ও নেককার লোকদের কাছে সাহায্য চাওয়া, তাদের কাছে বিপদাপদ হতে মুক্তি প্রার্থনা করা ও শত্রুর বিরুদ্ধে বিজয় কামনা করা ইত্যাদি।

২। আওলিয়া ও নেককার লোকদের মসজিদে কবর দেওয়া

বিশ্বের বিভিন্ন মুসলিম দেশে এমন অনেক মসজিদ দেখা যায়, যাতে কবর আছে। তার ওপর গম্বুজ, কুব্বা ইত্যাদি তৈরি করা হয়েছে। অনেক লোক আল্লাহকে বাদ দিয়ে প্রার্থনার জন্য সেসব কবরস্থ ব্যক্তি বর্গের কাছে যেতে চায়।

এ ব্যাপারে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিষেধাজ্ঞা আরোপ করে বলেন,

«لَعَنَ اللَّهُ اليَهُودَ وَالنَّصَارَى، اتَّخَذُوا قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسْجِدًا»

“ইয়াহূদী ও খৃষ্টানদের ওপর আল্লাহ তা‘আলার অভিশাপ, তারা তাদের নবীদের কবরকে (সেজদার জায়গা) মসজিদ বানিয়ে নিয়েছে”।[45]

নবীগণকে মসজিদে দাফন করা যদি ইসলামী রীতি বিরুদ্ধ, কাফিরদের অভ্যাস ও বৈশিষ্ট্য হয়ে থাকে। তাহলে সেখানে আওলিয়া ও পীরদের

[45] সহীহ বুখারী, হাদীস নং ১৩৩০, সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ৫২৯।

দাফন করা জায়েয হয় কীভাবে? বিশেষ করে আল্লাহ ব্যতীত এ সব লোকদের নিকট প্রার্থনা করা হলে শির্ক হবে মর্মে জানা থাকার পরও।

৩। আওলিয়াদের নামে মান্নত করা, নযর-নেয়ায দেওয়া

কোনো কোনো ব্যক্তি গরু-ছাগল, হাঁস-মুরগী, টাকা-পয়সা ইত্যাদি নির্দিষ্ট ওলীকে নযর দেয়। তার নামে মান্নত করে। এই নযর দেওয়া শির্ক। কারণ, নযর দেওয়া ইবাদত। যা শুধুমাত্র আল্লাহর জন্যই হতে হবে। সুতরাং এ ব্যাধি থেকে বিরত হওয়া অতীব জরুরী।

৪। নবী ও আওলিয়াদের কবরের কাছে জবেহ করা

যদিও জবেহ আল্লাহর নামেই করা হয়। কারণ, এটি মূলতঃ মুশরিকদের কাজ। তারা তাদের যেসব ওলীদের মূর্তি বানিয়ে পূজা করত, তাদের মাজারে পশু নিয়ে জবেহ করত। আর যদি আল্লাহ ব্যতীত তাদের নামে জবেহ করা হয় তাহলেতো শির্ক হবার ব্যাপারে কোনো সন্দেহই থাকে না।

৫। নবী ও ওলীদের কবরের তাওয়াফ করা

যেমন, আব্দুল কাদের জিলানী রহ. মাঈনুদ্দিন চিশতী রহ. প্রমুখ। কারণ, তাওয়াফ হচ্ছে নির্দিষ্ট ইবাদত, যা কাবার চারপার্শ্বে ছাড়া অন্যত্র জায়েয নেই। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বলেন,

﴿وَلۡيَطَّوَّفُواْ بِٱلۡبَيۡتِ ٱلۡعَتِيقِ ٢٩﴾ [الحج: ٢٩]

“তারা যেন প্রাচীন ঘরের তাওয়াফ করে”। [সূরা আল-হজ, আয়াত: ২৯]

৬। কবরের উপর সালাত আদায় করা

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

«لَا تَجْلِسُوا عَلَى الْقُبُورِ، وَلَا تُصَلُّوا إِلَيْهَا»

“তোমরা কবরের ওপর বস না এবং তার ওপর সালাত আদায় কর না”।[46]

৭। বরকত লাভের আশায় কবর ও মাজারের উদ্দেশ্যে ভ্রমণ করা, কিংবা সেখানে গিয়ে সালাত আদায় করা

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

«لاَ تُشَدُّ الرِّحَالُ إِلَّا إِلَى ثَلاَثَةِ مَسَاجِدَ: المَسْجِدِ الحَرَامِ، وَمَسْجِدِ الرَّسُولِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَمَسْجِدِ الأَقْصَى»

“তিনটি মসজিদ ছাড়া অন্য কোনো দিকে ভ্রমণ করা যায় না, মসজিদুল হারাম, আমার এ মসজিদ এবং মসজিদুল আকসা”।[47]

সুতরাং মদীনা শরীফ যিয়ারতের ইচ্ছা হলে আমরা নিয়ত করবো এ বলে, মসজিদে নাওয়াওয়ী যিয়ারতের জন্য যাচ্ছি ।

৮। আল্লাহ তা‘আলার নাযিলকৃত আইন ছাড়া ভিন্ন আইনে শাসন ও বিচারকার্য পরিচালনা করা:

---

[46] সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ৯৭২।

[47] সহীহ বুখারী, হাদীস নং ১১৮৯, সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ১৩৯৭।

যেমন, জায়েয জ্ঞান করে কুরআন ও সহীহ হাদীসের মর্ম পরিপন্থী মানুষের বানানো আইন দ্বারা বিচার ও শাসন কার্য পরিচালনা করা। অনুরূপভাবে বিভিন্ন জায়গায় দেখা যায়, অনেক আলিম নামধারী ব্যক্তিবর্গ কুরআন ও হাদীসের বিপরীতে ফাতওয়া দিয়ে থাকে। যেমন, অনেক স্থানে স্থানীয় আলিমরা সূদকে হালাল বলে ফাতওয়া দিয়েছে, অথচ আল্লাহ সূদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেছেন।

৯। কুরআন ও সহীহ হাদীসের বিপরীতে নেতৃবর্গ, আলিম-উলামা বা পীর-বুজর্গদের আনুগত্য করা।

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

«لَا طَاعَةَ لِمَخْلُوقٍ فِي مَعْصِيَةِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ»

“স্রষ্টার অবাধ্যতার কাজে সৃষ্টির আনুগত্য করা যাবে না”।[48]

আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

﴿ٱتَّخَذُوٓاْ أَحۡبَارَهُمۡ وَرُهۡبَٰنَهُمۡ أَرۡبَابٗا مِّن دُونِ ٱللَّهِ وَٱلۡمَسِيحَ ٱبۡنَ مَرۡيَمَ وَمَآ أُمِرُوٓاْ إِلَّا لِيَعۡبُدُوٓاْ إِلَٰهٗا وَٰحِدٗاۖ لَّآ إِلَٰهَ إِلَّا هُوَۚ سُبۡحَٰنَهُۥ عَمَّا يُشۡرِكُونَ ٣١﴾ [التوبة: ٣١]

“তারা আল্লাহকে ছেড়ে তাদের পণ্ডিতগণ ও সংসার-বিরাগীদের রব হিসেবে গ্রহণ করেছে এবং মারইয়ামপুত্র মাসীহকেও। অথচ তারা এক ইলাহের ইবাদত করার জন্যই আদিষ্ট হয়েছে, তিনি ছাড়া কোনো (হক)

[48] মুসনাদ আহমদ, হাদীস নং ১০৯৪, শুয়াইব আরনাউত হাদীসটিকে বুখারী ও মুসলিমের শর্তে সহীহ বলেছেন।

ইলাহ নেই। তারা যে শরীক করে তিনি তা থেকে পবিত্র”। [সূরা আত-তাওবাহ, আয়াত: ৩১]

হুযাইফা রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু তাদের ইবাদতের ব্যাখ্যায় বলেছেন, তাদের আলিমরা যা হালাল করত তারাও তা হালাল বলে মেনে নিত অনুরূপভাবে যা হারাম করত, তারাও তাকে হারাম জ্ঞান করত। ব্যাপারটি আল্লাহর হুকুমের বিপরীত হলেও তারা তা-ই করত।

মাজার ও দর্শনীয় বস্তুর বিধান

বর্তমান মুসলিম বিশ্বের নানা দেশ যেমন, সিরিয়া, ইরাক, মিশর, হিন্দুস্থান ও বাংলাদেশে যে সব মাজার (সংস্কৃতি) দেখা যাচ্ছে, তা সম্পূর্ণরূপে ইসলামী শিক্ষা ও আদর্শ বিরুদ্ধ। কারণ, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কবরের উপর ঘর বা সৌধ নির্মাণ, কবরে ঘটা করে উপস্থিত হওয়া এবং সেখানে উৎসব আয়োজন করতে পরিস্কার নিষেধ করেছেন।

«نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُجَصَّصَ الْقَبْرُ، وَأَنْ يُقْعَدَ عَلَيْهِ، وَأَنْ يُبْنَى عَلَيْهِ»

“রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কবর চুনকাম বা প্লাষ্টার করা, করবের উপর বসা এবং তার ওপর ঘর (বা সৌধ) নির্মাণ নিষিদ্ধ করেছেন”।[49]

তিরমিযীতে আছে: তিনি আরো নিষিদ্ধ করেছেন, তার উপর কোনো কিছু লিখতে- সেটি কুরআনের আয়াতই হোক কিংবা কবিতাই হোক।

১। অধিকাংশ ক্ষেত্রে দেখা যায় এ সব মাজারের নামকরণই ভুল ও বিভ্রান্তি মূলক। যেমন, হোসাইন রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু শাহাদাত বরণ করেন ইরাকের কারবালায়, তাঁকে মিশরে নেওয়া হয়নি। (বরং কারবালাতেই সমাহিত করা হয়েছে এটিই স্বাভাবিক)। সুতরাং মিশরে তাঁর কবর ও সমাধি আবিষ্কার করা মিথ্যা বৈ নয়। এর চেয়ে বড় প্রমাণ

[49] সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ৯৭০।

হচ্ছে, মুসলিমদেরকে মসজিদে দাফন করা হয় না। কারণ, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অভিস্পাত করে বলেছেন,

«قَاتَلَ اللَّهُ الْيَهُودَ، اتَّخَذُوا قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ»

"আল্লাহ ইয়াহূদীদের ধ্বংস করুন। কারণ, তারা তাদের নবীদের কবরগুলোকে (সাজদাহ'র স্থান) মসজিদে রূপান্তরিত করেছে"।[50]

এ কড়াকড়ি আরোপের তাৎপর্য হচ্ছে, মসজিদগুলোকে শির্ক হতে সংরক্ষিত রাখা।

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿وَأَنَّ ٱلْمَسَٰجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُواْ مَعَ ٱللَّهِ أَحَدًا ١٨﴾ [الجن: ١٨]

"আর নিশ্চয় মসজিদগুলো আল্লাহরই জন্য। কাজেই তোমরা আল্লাহর সাথে অন্য কাউকে ডেকো না"। [সূরা আল-জিন্ন, আয়াত: ১৮]

এখানে প্রশ্ন আসতে পারে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে মসজিদে দাফন করা হলো কীভাবে? জবাবে বলব, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দাফন করা হয়েছিল মূলতঃ আয়েশা রাদিয়াল্লাহু 'আনহুর ঘরে। মসাজিদে নয়। উমাইয়া শাসকরা মসজিদকে প্রশস্ত করার সময় তাঁর কবরকেও এর মধ্যে প্রবেশ করায়।

হোসাইন রাদিয়াল্লাহু 'আনহুর কবর এখন মসজিদের মধ্যে অবস্থিত। কিছু কিছু লোক তার চতুরপার্শ্বে তাওয়াফ করে। রোগ ও বিপদমুক্তির

---

[50] সহীহ বুখারী, হাদীস নং ৪৩৭, সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ৫৩০।

মতো বিষয় তার কাছে প্রার্থনা করে যা কেবল আল্লাহ তা'আলার ক্ষমতাধীন। (আমাদের বক্তব্য হচ্ছে) আমাদের দীন আমাদেরকে অনুমোদন দেয় কেবল আল্লাহর নিকট প্রার্থনা করতে। আর নিষেধ করে কাবা ছাড়া অন্য কোনো ঘর তাওয়াফ করতে।

২। ইসলাম কবরের ওপর গম্বুজ-সৌধ ইত্যাদি নির্মাণ করতে কঠোরভাবে নিষেধ করেছে ।এগুলো কেবল মসজিদের জন্য নির্মাণের অনুমোদন দেয়। বর্তমানে হোসাইন রাদিয়াল্লাহু 'আনহু ও আব্দুল কাদের জিলানীসহ বিভিন্ন লোকের কবর ও মাজারের ওপর যেসব গম্বুজ ও সৌধ দেখা যায় তা ইসলামে সরাসরি নিষিদ্ধ। (লেখক বলেন) আমার এক বন্ধু বলেছেন, আমি এক ব্যক্তিকে কেবলা ত্যাগ করে আব্দুল কাদের জিলানী রহ.-এর কবরের দিকে মুখ করে সালাত আদায় করতে দেখি। এ বিষয়ে তাকে উপদেশ দিলে সে তা পরিত্যাগ করতে অস্বীকার করে। আর আমাকে আক্রমণ করে বলে, আপনি একজন ওহাবী। হয়ত সে কবরের উপর বসা ও কবরের দিকে মুখ করে সালাত আদায় যে কঠোরভাবে নিষিদ্ধ সে সংক্রান্ত হাদীসগুলো শুনে নি।

৩। অধিকাংশ মাজার ও স্মৃতি:সৌধগুলো ফাতেমীদের সময় নির্মিত হয়েছে। আল্লামা ইবন কাসীর রহ. তাদের সম্বন্ধে বলেছেন, কাফির, ফাসিক, পাপিষ্ঠ ধর্মত্যাগী, মুনাফিক, আল্লাহর সিফাত অস্বীকারকারী ও ইসলাম অস্বীকারকারী অগ্নি পূজকদের মত তারা ছিল কাফির। তারা সালাত ও হজ আদায় করত না। কিন্তু লক্ষ্য করে দেখল মসজিদগুলো মুসল্লিতে পরিপূর্ণ। তারা মুসলিমদের হিংসা করত। তাই তাদেরকে

মসজিদ হতে সরিয়ে দেওয়ার ষড়যন্ত্র করল। তারই অংশ হিসেবে বিভিন্ন স্থানে মিথ্যা মাজার ও তাতে কুব্বা-গম্বুজ ও সৌধ নির্মাণ করল। সাধারণ লোকদের মাঝে প্রচারণা চালালো যে এগুলো হচ্ছে হোসাইন রাদিয়াল্লাহু 'আনহু ও জয়নাবের রাদিয়াল্লাহু 'আনহু কবর। লোকদের আকৃষ্ট করতে সেগুলোতে নানা উৎসবের ব্যবস্থা করল এবং নিজেদের আসল পরিচয় আড়াল করার উদ্দেশ্যে নিজেদেরকে ফাতেমী নামে আখ্যায়িত করল। বিশ্বের অন্যান্য মুসলিমরা তাদের কাছ থেকে শির্কে নিক্ষেপকারী এ বিদ'আত গ্রহণ করেছে। এর পেছনে প্রচুর টাকা-পয়সা অপচয় করছে। অথচ এ মুহূর্তে নিজেদের দীন ও সম্মান রক্ষার্থে সামরিক প্রস্তুতি, অস্ত্রপাতি কেনা ও তৈরির জন্য অর্থ-কড়ি সঞ্চয়ের দরকার ছিল বেশি।

৪। কিছু কিছু মুসলিম নিজেদের টাকা পয়সা অহেতুক কবরের পেছনে ব্যয় করছে। কবরের ওপর ঘর নির্মাণ করছে, করবকে মাজারে পরিণত করছে, দেওয়াল দিয়ে তা ঘিরে রাখছে এবং তার উপর নানা নিদর্শন তৈরি করছে। অথচ এগুলো মৃতুদের কোনোই উপকারে আসে না। যদি এ সব টাকা-পয়সা গরীব-অসহায়-বিত্তহীনদের পিছনে ব্যয় করত, তাহলে এর মাধ্যমে জীবিত ও মৃত উভয় শ্রেণির লোকেরাই উপকৃত হত। ইসলাম তার অনুসারীদেরকে কবরের পেছনে অহেতুক অর্থ ব্যয় করতে কঠোরভাবে নিষেধ করেছে। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আলী রাদিয়াল্লাহু 'আনহুকে বলেছেন,

«أَلَا أَبْعَثُكَ عَلَى مَا بَعَثَنِي عَلَيْهِ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ «أَنْ لَا تَدَعَ تِمْثَالًا

إِلَّا طَمَسْتَهُ وَلَا قَبْرًا مُشْرِفًا إِلَّا سَوَّيْتَهُ»

“কোনো সৌধ পেলে অবশ্যই তা নিঃশ্চিহ্ন করে দেবে এবং কোনো উঁচু কবর পেলে তা ভেঙ্গে মাটির সাথে সমান করে দেবে”। [51]

হ্যাঁ, ইসলাম কবরকে এক বিঘত পরিমাণ উঁচু করতে অনুমতি দিয়েছে।

৫। মৃতুদের জন্য নযর পেশ করা বড় শির্কের অন্তর্ভূক্ত। এসব পেশকৃত বস্তু মূলতঃ তাদের খাদেমদের হারামভাবে উপার্জিত সম্পদ। তারা তা পাপ ও ভোগ-লালসার কাজে ব্যয় করে। ফলে, নযর দাতা ও গ্রহীতা উভয়ই সমানভাবে এই পাপের অংশীদার হবে। যদি এই টাকাগুলো সহায় সম্বলহীন গরীবদের দান করা হত তাহলে তারা উপকৃত হতে পারত। আর দানকারীরাও যে নিয়তে দান করছে তার ফল পেত।

---

[51] সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ৯৬৯।

শির্কের ক্ষতিকর দিক ও তার বিপদসমূহ

ব্যক্তি ও সমাজ জীবনে শির্কের অনেক অনিষ্টকর দিক আছে। তার মাঝে বিশেষ বিশেষ কয়েকটি এখানে উল্লেখ করা হলো,

১। শির্ক মানবতার জন্য অবমাননাকর,

শির্ক মানুষের সম্মানকে ধুলায় মিশিয়ে দেয়, তার সামর্থ ও মর্যাদা নীচু করে দেয়। কারণ, আল্লাহ তা'আলা মানুষকে তাঁর খলীফা হিসাবে দুনিয়াতে পাঠিয়েছেন। তাদেরকে সম্মানিত করেছেন। তাঁর সমস্ত নাম শিখিয়েছেন। আসমান ও যমীনস্থ সব কিছু তাদের অনুগত করে দিয়েছেন। এই জগতের সকলের ওপর নেতৃত্ব ও কর্তৃত্ব দিয়েছেন। কিন্তু শির্ক করে তারা প্রমাণ করেছে যে তারা তাদের সে অবস্থা ও অবস্থানকে ভুলে গেছে। ফলে তাদের অধীনস্থ ও মর্যাদায় তাদের থেকে নীচু কোনো জিনিসকে নিজেদের ইলাহ ও মা'বুদ বানিয়ে নিয়েছে এবং এরই মাধ্যমে নিজেদেরকে ছোট ও অপমানিত করেছে। এর থেকে অসম্মানের বিষয় আর কী হতে পারে, যে গাভীকে আল্লাহ মানুষের খেদমতের জন্য সৃষ্টি করেছেন, যাকে জবাই করে খাওয়ার অনুমতি দিয়েছেন সে গাভীকে আজ হিন্দুস্তানসহ বিশ্বের বিভিন্ন দেশে পূজা করা হয়। তাদের কাছে আরাধণা করা হয়। আরো বিস্ময়কর ব্যাপার হচ্ছে, অনেক মুসলিম ব্যক্তিবর্গ মৃত মানুষের কবরের চারপাশে ঝাঁক ধরে বসে থাকে। তাদের কাছে নিজেদের প্রয়োজন নিবেদন করে। অথচ এসব মৃত ব্যক্তি তাদের মতই আল্লাহর দাস। তারা নিজেদেরই কোনো উপকার বা ক্ষতি করতে পারে না। লক্ষ্য করে দেখুন, হোসাইন

রাদিয়াল্লাহু ‘আনহুর কবরের চতুর্পাশ্বে বর্তমানে লোকেরা ভিড় জমায়। নিজেদের কষ্ট দূর করার জন্য তাঁর নিকট প্রার্থনা করে। অথচ তিনি জীবত অবস্থায়ই নিজেকে শহীদ হওয়ার হাত থেকে বাঁচাতে পারেননি। নিজের মুসিবত দূর করতে পারেন নি। তাহলে মৃত্যুর পর কেমন করে অপরের কষ্ট দূর করবেন? মানুষের ভালো ডেকে আনবেন? বরং সত্য কথা হলো মৃত ব্যক্তিরাই জীবিত মানুষের দো‘আর মূখাপেক্ষী। তাই আমাদের উচিৎ আমরা যেন তাদের জন্য দো‘আ করি। আল্লাহকে ছেড়ে কোনো অবস্থাতেই যেন তাদের কাছে দো‘আ না চাই ।

এ সম্বন্ধে আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

﴿وَٱلَّذِينَ يَدۡعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ لَا يَخۡلُقُونَ شَيۡـٔٗا وَهُمۡ يُخۡلَقُونَ ۝٢٠ أَمۡوَٰتٌ غَيۡرُ أَحۡيَآءٖۖ وَمَا يَشۡعُرُونَ أَيَّانَ يُبۡعَثُونَ ۝٢١﴾ [النحل: ٢٠، ٢١]

“আর তারা আল্লাহ ছাড়া যাদেরকে ডাকে, তারা কিছু সৃষ্টি করতে পারে না, বরং তাদেরকেই সৃষ্টি করা হয়। (তারা) মৃত, জীবিত নয় এবং তারা জানে না কখন তাদের পুনরুজ্জীবিত করা হবে”। [সূরা আন-নাহল, আয়াত: ২০-২১]

অন্যত্র আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

﴿حُنَفَآءَ لِلَّهِ غَيۡرَ مُشۡرِكِينَ بِهِۦۚ وَمَن يُشۡرِكۡ بِٱللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ ٱلسَّمَآءِ فَتَخۡطَفُهُ ٱلطَّيۡرُ أَوۡ تَهۡوِي بِهِ ٱلرِّيحُ فِي مَكَانٖ سَحِيقٖ ۝٣١﴾ [الحج: ٣١]

“আর যে আল্লাহর সাথে শরীক করে, সে যেন আকাশ থেকে পড়ল। অতঃপর পাখি তাকে ছোঁ মেরে নিয়ে গেল কিংবা বাতাস তাকে দূরের কোনো জায়গায় নিক্ষেপ করল”। [সূরা আল-হজ, আয়াত: ৩১]

২। শির্কের কারণে আজেবাজে কুসংস্কার ও বাতিল রসম-রেওয়াজ মানুষের মধ্যে প্রবেশ করে:

কারণ, যে ব্যক্তি বিশ্বাস করে এই জগতে আল্লাহ ছাড়াও অন্যের প্রভাব আছে। যেমন, গ্রহ-নক্ষত্র, জিন্ন, নশ্বর আত্মা ইত্যাদি তার বোধ-বুদ্ধি এমন হয়ে যায় যে, নানা কুসংস্কারকে সে গ্রহণ করতে তৈরি হয়ে যায় এবং সকল মিথ্যাবাদী-দাজ্জালদের বিশ্বাস করতে শুরু করে। আর এইভাবেই জিন বশকারী, গণক, যাদুকর, জ্যোতিষী এবং এ জাতীয় লোকদের মাধ্যমে সমাজের মধ্যে শির্ক প্রবেশ করে থাকে। তারা মিথ্যা দাবী করে বলে যে, আমরা ভবিষ্যৎ সম্পর্কে বলতে পারি, সামনে কি হবে আমাদের সব জানা আছে। অথচ এসব বিষয় আল্লাহ ব্যতীত আর কেউ জানে না। এসব কারণে সমাজের মধ্যে ধীরে ধীরে আসবাব সংগ্রহের প্রচেষ্টা দুর্বল হয়ে যায় এবং জগতের নিয়ম পাল্টে যেতে থাকে।

৩। শির্ক সবচেয়ে বড় যুলুম:

বাস্তবিকই এটা যুলম। কারণ, সবচেয়ে বড় সত্য হলো আল্লাহ ছাড়া কোনো মা‘বুদ নেই এবং অন্য কোনো প্রতিপালকও নেই। তিনি ছাড়া আইন প্রণেতা আর কেউ নেই; কিন্তু মুশরিকরা আল্লাহকে ছেড়ে অন্যকে মা‘বুদ স্থির করে নেয়। অন্যের কাছ থেকে আইন ও বিধান গ্রহণ করে।

তাছাড়া মুশরিকরা নিজেদের ওপরও অবিচার ও যুলুম করে। কারণ, তারা তাদেরই মতো অন্য একজন দাশের গোলাম হয়ে যায়। অথচ আল্লাহ রাব্বুল আলামীন তাকে স্বাধীন বানিয়ে সৃষ্টি করেছেন। শির্ক অপরের ওপরও অবিচার বা যুলুম। কারণ, যে, আল্লাহর সাথে অন্যকে শরীক করল, সে তো মহা অত্যাচার করল। কারণ, এর মাধ্যমে সে এমন কাউকে সে হক দিল যার সেই অধিকার নেই।

৪। শির্ক হচ্ছে সমস্ত কল্পনা ও ভয়-ভীতির মূল:

কারণ, তার মাথায় নানা কুসংস্কার বাসা বাঁধতে শুরু করে এবং দলীল প্রমাণ বিহীন নানা আজে বাজে কথা ও কাজকে গ্রহণ করতে থাকে। ফলে সমস্ত দিক হতেই নানা ভীতি তাকে গ্রাস করে ফেলে। কারণ, সে এমন সব মাবূদের ওপর ভরসা করতে শিখেছে। যাদের অক্ষমতা স্বীকৃত। তারা প্রত্যেকেই নিজ বা অন্যের কল্যাণ বা ক্ষতি করতে অপারগ। এমনকি নিজেদের থেকেও তারা কষ্ট-মুসিবত দূর করতে পারে না। ফলে, যেখানে শির্ক চলে সেখানে কোনো বাহ্যিক কারণ, ছাড়াই নানা ধরণের কুসংস্কার ও ভীতি প্রকাশ পেয়ে থাকে।

আল্লাহ তা'আলা এ সম্বন্ধে বলেন,

﴿سَنُلۡقِي فِي قُلُوبِ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ ٱلرُّعۡبَ بِمَآ أَشۡرَكُواْ بِٱللَّهِ مَا لَمۡ يُنَزِّلۡ بِهِۦ سُلۡطَٰنٗاۖ وَمَأۡوَىٰهُمُ ٱلنَّارُۖ وَبِئۡسَ مَثۡوَى ٱلظَّٰلِمِينَ ١٥١﴾ [ال عمران: ١٥١]

"অচিরেই আমরা কাফিরদের অন্তরসমূহে আতঙ্ক ঢেলে দেব। কারণ, তারা আল্লাহর সাথে শরীক করেছে, যে সম্পর্কে আল্লাহ কোনো প্রমাণ

নাযিল করেন নি। আর তাদের আশ্রয়স্থল হলো আগুন এবং যালিমদের ঠিকানা কতই না নিকৃষ্ট”। [সূরা আলে ইমরান, আয়াত: ১৫১]

৫। শির্কের কারণে সম্পাদিত সকল নেক আমল নষ্ট হয়ে যায়:

কারণ, শির্ক তার অনুগামীদেরকে মাধ্যম ও শাফা‘আতকারীর ওপর ভরসা করতে শেখায়। ফলে, নেক আমল ত্যাগ করতে শুরু করে এবং এ ধারণার বশবর্তী হয়ে গুনাহ করতে শুরু করে, সমস্ত অলীরা তাদের জন্য আল্লাহর কাছে সুপারিশ করবে। এমনটিই ছিল ইসলামের আবির্ভাবের পূর্বে আরবদের বিশ্বাস।

এদের সম্বন্ধে আল্লাহ বলেন,

﴿وَيَعۡبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمۡ وَلَا يَنفَعُهُمۡ وَيَقُولُونَ هَٰٓؤُلَآءِ شُفَعَٰٓؤُنَا عِندَ ٱللَّهِۚ قُلۡ أَتُنَبِّـُٔونَ ٱللَّهَ بِمَا لَا يَعۡلَمُ فِي ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَلَا فِي ٱلۡأَرۡضِۚ سُبۡحَٰنَهُۥ وَتَعَٰلَىٰ عَمَّا يُشۡرِكُونَ ١٨﴾ [يونس: ١٨]

“আর তারা আল্লাহ ছাড়া এমন কিছুর ইবাদত করছে, যা তাদের ক্ষতি করতে পারে না এবং উপকারও করতে পারে না। আর তারা বলে, ‘এরা আল্লাহর নিকট আমাদের সুপারিশকারী’। বল, ‘তোমরা কি আল্লাহকে আসমানসমূহ ও যমীনে থাকা এমন বিষয়ে সংবাদ দিচ্ছ যা তিনি অবগত নন? তিনি পবিত্র মহান এবং তারা যা শরীক করে, তা থেকে তিনি অনেক ঊর্ধ্বে”। [সূরা ইউনুস, আয়াত: ১৮]।

খৃষ্টানদের বিশ্বাসের প্রতি লক্ষ্য করে দেখুন, যারা একটার পর একটা অন্যায় কাজ করে যাচ্ছে এ ধারণার বশবর্তী হয়ে যে, ঈসা ‘আলাইহিস

সালাম যখন শূলে চড়েছেন তখন তাদের সমস্ত গুণাহ মুছে দিয়ে গেছেন। সম্ভবত তারই অনুকরণে আজ অনেক মুসলিম ফরয, ওয়াজিব ত্যাগ করছে ও নানা হারাম কাজে জড়িত হচ্ছে এবং এ বিশ্বাস করে বসে আছে যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের জান্নাতে প্রবেশের জন্য অবশ্যই শাফাআত করবেন। অথচ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর আদরের কন্যা ফাতেমা রাদিয়াল্লাহু 'আনহু-কে বলেছেন,

«يَا فَاطِمَةُ بِنْتَ مُحَمَّدٍ سَلِينِي مَا شِئْتِ مِنْ مَالِي لاَ أُغْنِي عَنْكِ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا»

"হে ফাতিমা বিনতে মুহাম্মাদ! তুমি আমার সম্পদ হতে যা ইচ্ছা চেয়ে নাও। আখিরাতে আল্লাহর হাত থেকে তোমাকে বাঁচানোর ব্যাপারে আমার কোনো ক্ষমতা নেই"। [52]

৬। শির্কের কারণে মানুষ চিরস্থায়ীভাবে জাহান্নামে প্রবেশ করবে:

শির্কের কারণে মানুষ পৃথিবীতে ধ্বংস হয়ে যায় এবং আখিরাতের চিরস্থায়ী আযাব ভোগ করবে। আল্লাহ বলেন,

﴿إِنَّهُۥ مَن يُشۡرِكۡ بِٱللَّهِ فَقَدۡ حَرَّمَ ٱللَّهُ عَلَيۡهِ ٱلۡجَنَّةَ وَمَأۡوَىٰهُ ٱلنَّارُۖ وَمَا لِلظَّٰلِمِينَ مِنۡ أَنصَارٖ ٧٢﴾ [المائدة: ٧٢]

[52] সহীহ বুখারী, হাদীস নং ২৭৫৩।

“যে ব্যক্তি আল্লাহর সাথে শির্ক করবে, আল্লাহ তার জন্য জান্নাতকে হারাম করে দিয়েছেন, তার ঠিকানা আগুন এবং যালিমদের কোনো সাহায্যকারী নেই”। [সূরা আল-মায়েদা, আয়াত: ৭২]

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

«مَنْ مَاتَ وَهْوَ يَدْعُو مِنْ دُونِ اللَّهِ نِدًّا دَخَلَ النَّارَ»

“যে ব্যক্তি এমতাবস্থায় মারা গেল যে, আল্লাহ ব্যতীত কোনো সমকক্ষ ডাকত, সে জাহান্নামে প্রবেশ করবে”।[53]

৭। শির্ক উম্মতের ঐক্য ইবনষ্ট করে তাদেরকে টুকরা টুকরা করে দেয়:

আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

﴿وَلَا تَكُونُواْ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ٣١ مِنَ ٱلَّذِينَ فَرَّقُواْ دِينَهُمْ وَكَانُواْ شِيَعًاۖ كُلُّ حِزْبِۭ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ ٣٢﴾ [الروم: ٣١، ٣٢]

“তোমরা মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত হয়ো না। যারা নিজেদের দীনকে বিভক্ত করেছে এবং যারা বিভিন্ন দলে বিভক্ত হয়েছে। (তাদের অন্তর্ভুক্ত হয়ো না)। প্রত্যেক দলই নিজদের যা আছে তা নিয়ে আনন্দিত”। [সূরা আর-রূম, আয়াত: ৩১-৩২]

---

[53] সহীহ বুখারী, হাদীস নং ৪৪৯৭।

মূল কথা:

আলোচনা থেকে পরিস্কারভাবে এটাই ফুটে উঠেছে যে, শির্ক খুবই মন্দ ও নিকৃষ্ট কাজ। তাই তা থেকে বেঁচে থাকা ফরয। তাতে জড়িয়ে পড়ার ব্যাপারে যার পর নাই সতর্ক থাকা এবং যতদূর সম্ভব তা হতে দূরে অবস্থান করা প্রতিটি মুসলমানের জন্য অবশ্য কর্তব্য। কারণ, এটি সবচেয়ে বড় গুনাহ। যা বান্দার সমস্ত নেক আমল নিষ্ফল ও ইবনষ্ট করে দেয়। যেমন, আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿وَقَدِمْنَآ إِلَىٰ مَا عَمِلُواْ مِنْ عَمَلٖ فَجَعَلْنَٰهُ هَبَآءٗ مَّنثُورًا ۝٢٣﴾ [الفرقان: ٢٣]

"আর তারা যে কাজ করেছে আমি সেদিকে অগ্রসর হব। অতঃপর তাকে বিক্ষিপ্ত ধূলিকণায় পরিণত করে দেব"। [সূরা আল-ফুরকান, আয়াত: ২৩]

শরী'আতসম্মত ওসীলা তালাশ করা

আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বলেন,

﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَٱبۡتَغُوٓاْ إِلَيۡهِ ٱلۡوَسِيلَةَ ٣٥﴾ [المائدة: ٣٥]

"হে মুমিনগণ! আল্লাহকে ভয় কর এবং তাঁর কাছে ওসীলা তালাশ কর (অর্থাৎ তার নৈকট্যের অনুসন্ধান কর)"। [সূরা আল-মায়েদা, আয়াত: ৩৫]

এ আয়াতের তাফসীরে কাতাদাহ রহ. বলেছেন, তাঁর আনুগত্য ও সে সব আমলের মাধ্যমে তাঁর নৈকট্য অর্জন কর যে সব আমল তিনি পছন্দ করেন এবং সন্তুষ্ট হন। শরী'আতসম্মত ওসীলা তালাশ করার ব্যাপারে আল কুরআন আমাদেরকে হুকুম করেছে এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামও তাগিদ দিয়েছেন। সাহাবায়ে কিরাম রাদিয়াল্লাহু 'আনহু সে নির্দেশ মোতাবেক আমল করেছেন। ওসীলা তালাশের বিষয়টি কয়েকটি ভাগে বিভক্ত। বিশেষ কয়টি এখানে উল্লেখ করা হলঃ

১। ঈমানকে ওসীলা বানান:

অর্থাৎ ঈমানের ওসীলা দিয়ে কিছু প্রার্থনা করা। বান্দারা ঈমানের সাহায্যে কীভাবে ওসীলা তালাশ করবে- সে সম্বন্ধে আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿رَّبَّنَآ إِنَّنَا سَمِعۡنَا مُنَادِيٗا يُنَادِي لِلۡإِيمَٰنِ أَنۡ ءَامِنُواْ بِرَبِّكُمۡ فَـَٔامَنَّاۚ رَبَّنَا فَٱغۡفِرۡ لَنَا ذُنُوبَنَا وَكَفِّرۡ عَنَّا سَيِّـَٔاتِنَا وَتَوَفَّنَا مَعَ ٱلۡأَبۡرَارِ ١٩٣﴾ [ال عمران: ١٩٣]

“হে আমাদের রব, নিশ্চয় আমরা শুনেছিলাম একজন আহ্বানকারীকে, যে ঈমানের দিকে আহবান করে যে, ‘তোমরা তোমাদের রবের প্রতি ঈমান আন’। তাই আমরা ঈমান এনেছি। হে আমাদের রব আমাদের গুনাহসমূহ ক্ষমা করুন এবং বিদূরিত করুন আমাদের ত্রুটি-বিচ্যুতি, আর আমাদেরকে মৃত্যু দিন নেককারদের সাথে”। [সূরা আলে ইমরান, আয়াত: ১৯৩]

২। আল্লাহর একত্ববাদকে ওসীলা বানান:

যেমন, ইউনুস ‘আলাইহিস সালামকে যখন মাছে গিলে ফেলেছিল তিনি দো‘আ করেছিলেন, সে প্রসঙ্গে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন পবিত্র কুরআনে বলেন,

﴿فَنَادَىٰ فِي ٱلظُّلُمَٰتِ أَن لَّآ إِلَٰهَ إِلَّآ أَنتَ سُبۡحَٰنَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ ٱلظَّٰلِمِينَ ٨٧ فَٱسۡتَجَبۡنَا لَهُۥ وَنَجَّيۡنَٰهُ مِنَ ٱلۡغَمِّۚ وَكَذَٰلِكَ نُـۨجِي ٱلۡمُؤۡمِنِينَ ٨٨﴾ [الانبياء: ٨٧، ٨٨]

“তারপর সে অন্ধকার থেকে ডেকে বলেছিল, ‘আপনি ছাড়া কোনো (সত্য) ইলাহ নেই’। আপনি পবিত্র মহান। নিশ্চয় আমি ছিলাম যালিম’। অতঃপর আমি তার ডাকে সাড়া দিয়েছিলাম এবং দুশ্চিন্তা থেকে তাকে উদ্ধার করেছিলাম। আর এভাবেই আমরা মুমিনদেরকে উদ্ধার করে থাকি”। [সূরা আল-আম্বিয়া, আয়াত: ৮৭-৮৮]

৩। আল্লাহর পবিত্র নাম দ্বারা ওসীলা খোঁজা:

﴿وَلِلَّهِ ٱلۡأَسۡمَآءُ ٱلۡحُسۡنَىٰ فَٱدۡعُوهُ بِهَاۖ ١٨٠﴾ [الاعراف: ١٧٩]

“আল্লাহর সুন্দর সুন্দর নাম রয়েছে। সুতরাং এর দ্বারা তোমরা তাঁকে ডাকো”। [সূরা আল-আ‘রাফ, আয়াত: ১০০]

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর সুন্দর সুন্দর নামের মাধ্যমে তাঁর নিকট সাহায্য চাইতেন: বলতেন,

«أَسْأَلُكَ بِكُلِّ اسْمٍ هُوَ لَكَ سَمَّيْتَ بِهِ نَفْسَكَ»

“আমি তোমার কাছে তোমার সমস্ত নামের ওসীলায় প্রার্থনা করছি...”।[54]

৪। আল্লাহ তা‘আলার গুণাবলির দ্বারা ওসীলা তালাশ করা:

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলতেন:

«يَا حَيُّ يَا قَيُّومُ بِرَحْمَتِكَ أَسْتَغِيثُ».

“হে চিরঞ্জীব! হে চিরস্থায়ী, তোমার দয়ার দ্বারা বিপদ উদ্ধার চাচ্ছি।[55]

৫। নেক আমলের দ্বারা ওসীলা খোঁজা

যেমন, সালাত, মাতা-পিতার খেদমত, অন্যের হক আদায়, আমানত দারী ও অন্যান্য নেক আমলের মাধ্যমে আল্লাহর কাছে কিছু প্রার্থনা করা।

সহীহ মুসলিমে পাহাড়ী গুহায় আটকে পড়া তিন ব্যক্তির কথা বর্ণিত হয়েছে, যারা নিজ নিজ নেক আমলের ওসীলায় আল্লাহর সাহায্য প্রার্থনা

---

[54] মুসতাদরাক লিল হাকিম, হাদীস নং ১৮৭৭, তিনি হাদীসটিকে মুসলিলের শর্তে সহীহ বলেছেন।

[55] তিরমিযী, হাদীস নং ৩৫২৪, তিনি হাদীসটিকে গরীব বলেছেন।

করলে আল্লাহ তাদেরকে সেখান থেকে নাজাত দান করেন। তারা মাতা-পিতার খিদমত, শ্রমিকের হক ও আল্লাহর তাকওয়া-এর ওসীলায় দো'আ করেছিল, ফলে আল্লাহ তাদের হিফাযত করেন।

৬। পাপকার্য ত্যাগ করার দ্বারা ওসীলা তালাশ করা:

যেমন, আল্লাহ তা'আলার নিষিদ্ধকৃত যিনা, মদ ও এরূপ অন্যান্য হারাম কাজ। উল্লিখিত হাদীসে তিন ব্যক্তির একজন আপন চাচাত বোনের সাথে যিনা করার সুযোগ পেয়েও আল্লাহর ভয়ে তা ত্যাগ করেন, পরবর্তীতে গুহায় আটকে পড়লে সে যিনা ত্যাগের ওসীলায় আল্লাহর কাছে দো'আ করেন, আর আল্লাহ তার ডাকে সাড়া দিয়ে তাকে হেফাযত করেন।

৭। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওপর দুরূদ, তিনি ও তাঁর সাহাবীদের প্রতি ভালোবাসাকে ওসীলা বানান। এগুলো সেই সব নেক আমলের অন্তর্ভুক্ত যা সম্পাদনকারীকে আল্লাহর নিকটবর্তী করে দেয়।

৮। যাকাত আদায়, দান-সদকা, ভালো ভালো কথা, যিকর-আযকার, কুরআন তিলাওয়াত, একত্ববাদীদের প্রতি ভালোবাসা ও মুশরিকদের সাথে শত্রুতা পোষণকে ওসীলা বানানো।

৯। জীবিত নেককার লোকদের কাছে দো'আ চাওয়া:

যেমন, জনৈক দৃষ্টি প্রতিবন্ধী সাহাবী রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে দো'আ চেয়েছিলেন, যাতে আল্লাহ তার চোখের জ্যোতি ফিরিয়ে দেন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার জন্য

দো‘আ করেন এবং তাকেও তাঁর সাথে দো‘আ করতে বলেন। ফলে আল্লাহ তার চোখের জ্যোতি ফিরিয়ে দেন। কারণ, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দো‘আ কবুল হবে এবং সেটা তাঁর মুজিযা। জনৈক ব্যক্তি যাতে ব্যক্তি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শাফায়াত পান, তার জন্য আল্লাহ তা‘আলার কাছে দো‘আ করেন আর আল্লাহ তার দো‘আ কবুল করেন।

নিষিদ্ধ ও অর্থহীন ওসীলা তালাশ ও তার শ্রেণিবিভাগ

১। মৃত ব্যক্তির মাধ্যমে ওসীলা খোঁজা

মৃতদের কাছে প্রয়োজনীয় কোনো জিনিস প্রার্থনা করা কিংবা তাদের নিকট সাহায্য চাওয়া। কতিপয় মানুষ একে ওসীলা মনে করে, মূলে কিন্তু তা নয়। কারণ, ওসীলার অর্থ হলো আল্লাহর নিকটবর্তী হওয়া (বা অনুমোদিত পন্থায় তাঁর নৈকট্য অর্জন করা); যা কেবল ঈমান ও নেক আমলের দ্বারা সম্ভব। আর মৃত্যুদের কাছে দো'আ করা, তাদের নিকট সাহায্য প্রার্থনা করা প্রকারান্তরে আল্লাহ হতে মুখ ফিরিয়ে নেওয়া। যা বড় শির্কের অন্তর্ভূক্ত। কারণ, আল্লাহ বলেন,

﴿وَلَا تَدۡعُ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَا لَا يَنفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَۖ فَإِن فَعَلۡتَ فَإِنَّكَ إِذٗا مِّنَ ٱلظَّٰلِمِينَ ١٠٦﴾ [يونس: ١٠٦]

"আর আল্লাহ ছাড়া এমন কিছুকে ডেকো না, যা তোমার উপকার করতে পারে না এবং তোমার ক্ষতিও করতে পারে না। আর যদি তা কর তাহলে নিশ্চয় তুমি যালিম (মুশরিক)-দের অন্তর্ভূক্ত হবে"। [সূরা ইউনুস, আয়াত: ১০৬]

২। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জাত বা সম্মানের ওসীলা খোঁজা:

যেমন বলা, হে আমার রব! রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওসীলায় আমাকে রোগমুক্ত কর। এটা নিষিদ্ধ ও দীন বহির্ভূত বিদ'আত। কারণ, সাহাবীদের কেউ এমনটি কখনো করেন নি। খলীফা উমার

রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মুহতারাম চাচা আব্বাস রাদিয়াল্লাহু ‘আনহুর জীবিত অবস্থায় তাঁর ওসীলায় বৃষ্টির জন্য দো‘আ করিয়েছিলেন। তখন তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওসীলায় দো‘আ করতে পারতেন কিন্তু তিনি তা করেন নি। কারণ, নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম তখন জীবিত ছিলেন না। (আমাকে ওসীলা করে দো‘আ কর) মর্মে যে হাদীসটি উদ্ধৃত করা হয়, সেটি আসলে কোনো হাদীসই নয়। শাইখুল ইসলাম ইবন তাইমিয়া রহ. সে হাদীসকে জাল হিসাবে প্রমাণ করেছেন। এই নিষিদ্ধ ও বিদ‘আতী ওসীলা সংশ্লিষ্ট মানুষকে শির্ক পর্যন্ত পৌঁছে দেয়। কারণ, এসব ওসীলা গ্রহণকারীরা কখনো কখনো এমন ধারণা করে বসে যে, আল্লাহ কোনো মাধ্যম ছাড়া করতে পারেন না। এর মাধ্যমে আল্লাহকে সৃষ্টির সাথে তুলনা করা হয়। তাইতো এ প্রসঙ্গে ইমাম আবু হানিফা রহ. বলেছেন, আমি আল্লাহ ছাড়া অন্যকে ওসীলা করে আল্লাহর কাছে দো‘আ করাকে অপছন্দ করি।

৩। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মৃত্যুর পর তাঁকে সম্বোধন করে বলা যে, হে রাসূল! আমার জন্য দো‘আ করুন। এটা জায়েয নয়। কারণ, সাহাবীগণ কেউ এমনটি করেন নি। তাছাড়া নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

«إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ: إِلَّا مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ، أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ، أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ»

“মানুষ মারা গেলে তিনটি ব্যতীত তার সকল আমল বন্ধ হয়ে যায়, (সে তিনটি আমল হচ্ছে) সদকায়ে জারিয়া, এমন ইলম যার দ্বারা উপকৃত হওয়া যায় এবং নেক সন্তান যে তার জন্য দো‘আ করে”।[56]

এ আমলগুলোর সাওয়াব সম্পাদনকারী ব্যক্তিরা কবরেও পেতে থাকে।

আল্লাহ হতে সাহায্য পাওয়ার শর্তাবলী

সম্মানিত পাঠকবৃন্দ, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সিরাত, তাঁর কর্মপন্থা, জিহাদ ও মুজাহাদা সম্বন্ধে ব্যাপক পড়াশুনা করলে নিম্নোক্ত বিষয়গুলোই প্রথমে সামনে আসে,

১। তাওহীদের দাওয়াত

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রিসালাতের দায়িত্ব প্রাপ্তির পর পবিত্র মক্কাতে দীর্ঘ ১৩ বছর পর্যন্ত মানুষকে তাওহীদ ও একত্ববাদের প্রতি আহ্বান করেছেন। যাবতীয় ইবাদত, দো‘আ ও হুকুমে তাওহীদ প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে নিজেকে নিয়োজিত রেখেছেন। বিভিন্নভাবে তিনি লোকদের তাওহীদ গ্রহণ ও শির্ক বর্জনের তাগিদ দিয়েছেন। তাঁর নিরলস প্রচেষ্টায় এই আক্বীদা তাঁর সাহবীদের অন্তরে দৃঢ়ভাবে বসে যায়। তাই তাঁরা প্রত্যয়ী ও সাহসী হয়ে উঠেন। আল্লাহ ছাড়া আর কাউকে ভয় করতেন না। শত বাধা বিপত্তি সত্বেও তাওহীদের ওপর অবিচল থাকেন এবং ঘৃণাভরে যাবতীয় শির্ককে অস্বীকার করেন। সুতরাং দীনের পথের দায়ীদের ওপর তাই ওয়াজিব হচ্ছে, তাওহীদ

[56] সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ১৬৩১।

দিয়েই দাওয়াত শুরু করা এবং শির্কের ব্যাপারে ভীতি প্রদর্শন করা। আর এর মাধ্যমেই তারা নিজেদেরকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অনুগামী হিসাবে চিহ্নিত করতে সক্ষম হবে।

২। জাত, বর্ণ, গোত্র ভুলে দীনী ভ্রাতৃত্ব বোধে উদ্দীপ্ত হয়ে ইসলামী সমাজ ও রাষ্ট্র গঠন

মক্কায় তের বছর অতিবাহিত করার পর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মদীনায় হিজরত করেন। উদ্দেশ্য, বর্ণ গোত্রের সকল ভেদাভেদ ভুলে গিয়ে মুসলিমদের নিয়ে এমন এক সমাজ গঠন করা যা কেবল ভালোবাসার সূত্রে গঠিত হবে। সে লক্ষ্যকে সামনে রেখেই তিনি সেখানে সর্বপ্রথম মসজিদ নির্মাণ কাজে হাত দিলেন। যাতে মুসলিমরা আপন রবের ইবাদতের জন্য প্রত্যহ পাঁচবার মিলিত হবে এবং নিজেদের মাঝে হৃদ্যতা ও ভালোবাসার সম্পর্ক উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেতে থাকবে। পাশাপাশি তিনি মদিনার আদি অধিবাসী আনসার এবং মক্কা হতে গৃহ ও ধন-সম্পদ ত্যাগ করে আগমনকারী মুহাজিরদের মাঝে ভ্রাতৃত্ব বন্ধন প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ গ্রহণ করেন। সে মর্মে তিনি তাদের বিভিন্নভাবে অনুপ্রাণিত ও উৎসাহিত করেন। নবীসাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামের আন্তরিক প্রচেষ্টায় তাদের মাঝে এমন এক বন্ধনের সৃষ্টি হয় যা বিশ্ব ইতিহাস ইত:পূর্বে আর দেখেনি। আনসাররা নিজ ধন-সম্পদ মুহাজির ভাইদের সাথে ভাগাভাগি করে নিয়ছিলেন। এমনকি জনৈক সাহাবী তাঁর দু’স্ত্রীর একজনকে মুহাজির ভাইকে বেছে নিতে প্রস্তাব করেছিলেন। তারা মুহাজিরদের প্রয়োজনকে নিজের প্রয়োজনের

ওপর প্রাধান্য দিতেন। মদিনায় আগমন করার পর নবীজী লক্ষ্য করলেন সেখানের প্রসিদ্ধ গোত্র আউস ও খাজরায পরস্পর শত্রুতায় লিপ্ত। এ শত্রুতা তাদের মাঝে বহুদিন থেকে চলে আসছে। তিনি তাদের মধ্যকার যুগ যুগ ধরে বিরাজমান শত্রুতার স্থায়ীভাবে অবসান ঘটাতে সক্ষম হন এবং এমন এক ভ্রাতৃত্ব বন্ধনে আবদ্ধ করতে সচেষ্ট হন যা ইতিহাসে বিরল। এ ভালোবাসার সেতুবন্ধনের নাম হচ্ছে ঈমান ও তাওহীদ।

৩। নিজেদের প্রস্তুত করণ:

পবিত্র কুরআনে আল্লাহ মুসলিমদেরকে নিজ শত্রুদের বিরুদ্ধে তৈরি হতে নির্দেশ দিলেন। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বলেন,

﴿وَأَعِدُّواْ لَهُم مَّا ٱسۡتَطَعۡتُم مِّن قُوَّةٖ وَمِن رِّبَاطِ ٱلۡخَيۡلِ تُرۡهِبُونَ بِهِۦ عَدُوَّ ٱللَّهِ وَعَدُوَّكُمۡ ٦٠﴾ [الانفال: ٦٠]

“আর তাদের মুকাবিলার জন্য তোমাদের সামর্থ্য অনুযায়ী শক্তি ও অশ্ব বাহিনী প্রস্তুত কর, তা দ্বারা তোমরা ভয় দেখাবে আল্লাহর শত্রু ও তোমাদের শত্রুদেরকে...”। [সূরা আল-আনফাল, আয়াত: ৬০]

এই আয়াত সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ব্যাখ্যা দিয়েছেন:

«أَلَا إِنَّ الْقُوَّةَ الرَّمْيُ»

“তিনি বলেন, শোন! নিশ্চয় নিক্ষেপের মধ্যেই শক্তি”।[57]

---

[57] সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ১৯১৭।

তীর নিক্ষেপ ও সামর্থ্য অনুযায়ী তার প্রশিক্ষণ গ্রহণ করা সমস্ত মুসলিমের ওপর ওয়াজিব। অনুরূপভাবে কামান, ট্যাঙ্ক ও উড়োজাহাজ চালনাসহ অন্যান্য সামরিক অস্ত্রপাতির ব্যবহারের প্রশিক্ষণ নেওয়া তার অন্তর্ভুক্ত। আজ যদি স্কুল, কলেজ ও ইউনিভার্সিটির ছাত্ররা এসব অস্ত্রের প্রশিক্ষণ নিত এবং এ ব্যাপারে প্রতিযোগিতা করত। তাহলে তারা নিজ ব্যক্তি, দেশ ও দীন সংরক্ষণের কাজে ফল দিত। বড়ই পরিতাপের বিষয় আজ মুসলিম ছেলেরা তাদের সময় নষ্ট করছে ফুটবল, ক্রিকেট ইত্যাদি খেলার পিছনে। উরু বের করে খেলায় প্রতিযোগিতায় নেমেছে। অথচ ইসলাম আমাদেরকে উরু ঢেকে রাখার নির্দেশ দিয়েছে। এসব খেলাধুলায় জড়িত হতে গিয়ে তারা ইসলামের বুনিয়াদি ফরজ সালাতকে নষ্ট করে এমন গুরুতর অপরাধ করছে যা কুফুরীর শামিল।

৪। **আমাদের পূর্ববর্তীদের অনুবর্তিতায় আমরা যখন একই আক্বীদাহর ওপর প্রত্যাবর্তন করব** এবং আমল করতে থাকব তখন আমরাও পরস্পর ভাই ভাই হয়ে যাব। আমাদের মাঝে অটুট এক বন্ধন সৃষ্টি হবে। সেই একতার মাধ্যমে অন্যতম এক শক্তি তৈরি হবে। সেই শক্তিকে অবলম্বন করে আমরা যদি দীনের জন্য আমাদের শত্রুদের মোকাবেলার উদ্দেশ্যে আমাদের কাছে মওজুদ আরো সব অবলম্বন ও অস্ত্রপাতিসহ তৈরি হই, ইনশাআল্লাহ তখনই আল্লাহর তরফ থেকে আমাদের জন্য সাহায্য আসবে। যেমনিভাবে সাহায্য এসেছিল নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তার সাথীদের ওপর।

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِن تَنصُرُواْ ٱللَّهَ يَنصُرۡكُمۡ وَيُثَبِّتۡ أَقۡدَامَكُمۡ ٧﴾ [محمد: ٧]

“হে ঈমানদারগণ! যদি তোমরা আল্লাহকে সাহায্য কর, তাহলে আল্লাহও তোমাদের সাহায্য করবেন এবং তোমাদের পদসমূহকে সুদৃঢ় করবেন”। [সূরা মুহাম্মাদ, আয়াত: ৭]

৫। এসব কথার অর্থ এই নয় যে, এ অবস্থা আলাদাভাবে পরিলক্ষিত হবে। অর্থাৎ ভালোবাসা ও ভ্রাতৃত্ব তাওহীদের সাথে সাথে না এসে আলাদাভাবে আসবে, বরং এগুলো একে অপরের সাথে ওতপ্রোতভাবে সম্পৃক্ত।

আল্লাহ বলেন,

﴿وَكَانَ حَقًّا عَلَيۡنَا نَصۡرُ ٱلۡمُؤۡمِنِينَ ٤٧﴾ [الروم: ٤٧]

“আর মুমিনদের সাহায্য করাতো আমাদের কর্তব্য”। [সূরা আর-রূম, আয়াত: ৪৭]

উপরোক্ত আয়াতসহ বহু আয়াতে আল্লাহ রাহমানুর রাহীম মুমিনদের সাহায্য করার ব্যাপারে পরিস্কার অঙ্গীকার করেছেন। আর এ প্রতিশ্রুতি এমন এক সত্ত্বার যার পরিবর্তন হয় না। আল্লাহ তা‘আলা তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বদর, উহুদ, খন্দকসহ সব জিহাদে জয়যুক্ত করেছেন। আর এ বিজয় একমাত্র তাঁর সাহায্যের কারণেই সূচিত হয়েছে। তাঁর বিদায়ের পরও আল্লাহ তা‘আলা এ ধারা অব্যহত রেখেছেন। তাঁর সাহাবীদেরকে অসংখ্য বার তিনি শত্রুদের বিরুদ্ধে

জয়যুক্ত করেছেন। একইভাবে পৃথিবী ব্যাপী মুসলিমগণ আল্লাহর সাহায্য পেয়ে একর পর এক দেশ জয় করেছিলেন এবং ইসলামের বিজয় নিশ্চিত হয়েছিল। যদিও বিভিন্ন সময় তাদেরকে নানা ধরণের বিপদ-আপদ, বালা-মসিবত গ্রাস করেছিল। কিন্তু তারা সুখে দুঃখে- সর্বাবস্থায় ঈমান, তাওহীদ ও ইবাদতের ক্ষেত্রে নিজ রবের প্রতি আস্থা ও ভক্তিতে দৃঢ় ছিলেন বলে আল্লাহ তাদেরকে সাহায্য করেছেন। পরিণামে তারাই হয়েছিলেন জয়যুক্ত দল।

কুরআনুল কারীমে দৃষ্টি নিবদ্ধ করলে আমরা দেখতে পাই, বদরের যুদ্ধে মুসলিমরা সংখ্যায়, অস্ত্র ও সমর উপকরণে প্রতিপক্ষের তুলনায় ছিলেন খুবই নগণ্য। আল্লাহ তাদেরকে বললেন,

﴿إِذۡ تَسۡتَغِيثُونَ رَبَّكُمۡ فَٱسۡتَجَابَ لَكُمۡ أَنِّي مُمِدُّكُم بِأَلۡفٖ مِّنَ ٱلۡمَلَٰٓئِكَةِ مُرۡدِفِينَ ٩﴾ [الانفال: ٩]

“আর স্মরণ কর, যখন তোমরা তোমাদের রবের নিকট ফরিয়াদ করছিলে, তখন তিনি তোমাদের ডাকে সাড়া দিয়েছিলেন যে, নিশ্চয় আমি তোমাদেরকে পর পর আগমনকারী এক হাজার ফিরিশতা দ্বারা সাহায্য করছি”। [সূরা আল-আনফাল, আয়াত: ৯]

আল্লাহ রাব্বুল ইযযত তাদের দো‘আ কবুল করেন। ফরিশিতারা তাদের সাথে একত্রে যুদ্ধ করে তাঁদেরকে সাহায্য করেছিলেন। কাফিরদের গর্দান উড়িয়ে দিয়েছিলেন এবং অঙ্গ-প্রতঙ্গ কর্তন করেছিলেন। এ সম্বন্ধে আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

﴿فَٱضۡرِبُواْ فَوۡقَ ٱلۡأَعۡنَاقِ وَٱضۡرِبُواْ مِنۡهُمۡ كُلَّ بَنَانٖ ١٢﴾ [الانفال: ١٢]

“অতএব তোমরা আঘাত কর ঘাড়ের উপরে এবং আঘাত কর তাদের প্রত্যেক আঙুলের অগ্রভাগে”। [সূরা আল-আনফাল, আয়াত: ১২]

আল্লাহ তা‘আলা আরো বলেন,

﴿وَلَقَدۡ نَصَرَكُمُ ٱللَّهُ بِبَدۡرٖ وَأَنتُمۡ أَذِلَّةٞۖ فَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ لَعَلَّكُمۡ تَشۡكُرُونَ ١٢٣﴾ [ال عمران: ١٢٣]

“আর অবশ্যই আল্লাহ তোমাদেরকে বদরে সাহায্য করেছেন, অথচ তোমরা ছিলে হীনবল। অতএব তোমরা আল্লাহকে ভয় কর, আশা করা যায়, তোমরা শোকরগুজার হবে”। [সূরা আলে ইমরান, আয়াত: ১২৩]

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বদরে এ বলে দো‘আ করেছিলেন:

«اللهُمَّ آتِ مَا وَعَدْتَنِي، اللهُمَّ إِنْ تُهْلِكْ هَذِهِ الْعِصَابَةَ مِنْ أَهْلِ الْإِسْلَامِ لَا تُعْبَدْ فِي الْأَرْضِ»

“হে আল্লাহ! আমাকে যে প্রতিশ্রুতি তুমি দিয়েছ তা দান কর। হে আল্লাহ! ইসলাম অনুসারীদের এই ছোট দলকে যদি ধ্বংস করে দাও তাহলে পৃথিবীর বুকে আর তোমার ইবাদত থাকবে না”।[58]

আজ আমরা দেখতে পাচ্ছি যে, পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে মুসলিমগণ তাদের শত্রুদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করছে, কিন্তু কোথাও জয়যুক্ত হচ্ছে না।

---

[58] সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ১৭৬৩।

এর কারণ কী? আল্লাহ তা'আলা কি মুসলিমদের ব্যাপারে তাঁর ওয়াদা ভঙ্গ করছেন? না... কখনই না। তাহলে সে মুমিন কারা যাদেরকে তিনি সাহায্য করবেন বলে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন? আমরা জিহাদরত মুজাহিদ ভাইদেরকে বলছি, নিজেদের বিবেককে প্রশ্ন করুন,

১। যে মূলমন্ত্র দ্বারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মক্কার জীবনে, জিহাদে অবতীর্ণ হবার পূর্বেই সাহাবীদের উদ্বুদ্ধ করেছিলেন, তারা কি সেই ঈমান ও তাওহীদের শক্তিতে নিজেদেরকে শক্তিমান করেছেন?

২। তারা কি সেসব সমরোপকরণ ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন যাদের ব্যাপারে তাদের রব নির্দেশ দিয়েছেন? আল্লাহ রাব্বুল ইযযত বলেন,

﴿وَأَعِدُّواْ لَهُم مَّا ٱسۡتَطَعۡتُم مِّن قُوَّةٖ ٦٠﴾ [الانفال: ٦٠]

“এবং তোমরা তাদের বিরুদ্ধে যতটা পার শক্তি সঞ্চয় করতে থাক”। [সূরা আল-আনফাল, আয়াত: ৬০]

এই শক্তি বলতে বুঝিয়েছেন, তীর নিক্ষেপ (অনুরূপভাবে সামরিক শক্তি সঞ্চয়) করা।

৩। তারা কি আপন রবকে সর্বাবস্থায় ডাকেন? যুদ্ধের সময় এককভাবে একমাত্র তাঁর নিকটই দো'আ করেন? নাকি এই দো'আর ক্ষেত্রে তাঁর সাথে অন্যদেরও শরীক করেন? তারা যাদের ওলী বলে ধারণা করেন সেই সব মৃত ব্যক্তিদের কাছেও কি তারা দো'আ করেন? তারাতো

মূলতঃ আল্লাহ তা‘আলার বান্দা ও দাস। তারা নিজেদেরও ভালো কিংবা মন্দ কিছুই করতে পারে না। কেন তারা দো‘আর ক্ষেত্রে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অনুসরণ করেন না? যিনি সর্বাবস্থায় একমাত্র তাঁর রবের নিকটই দো‘আ করতেন।

আল্লাহ রাহমানুর রাহীম বলেন,

﴿أَلَيۡسَ ٱللَّهُ بِكَافٍ عَبۡدَهُۥۖ ٣٦﴾ [الزمر: ٣٥]

“আল্লাহ কি তার বান্দার জন্য যথেষ্ট নন”। [সূরা আয-যুমার, আয়াত: ৩৬]

৪। সর্বশেষ তাদের প্রতি আরজি করছি, আপনারা নিজ বিবেককে প্রশ্ন করুন, আপনারা কি একতাবদ্ধ এবং একে অপরকে সর্বাবস্থায় ভালোবাসেন?

আসলে সেসব মুজাহিদদের ক্ষেত্রে আল্লাহ তা‘আলার নিম্নোক্ত বাণীই প্রযোজ্য ।

﴿وَلَا تَنَٰزَعُواْ فَتَفۡشَلُواْ وَتَذۡهَبَ رِيحُكُمۡۖ ٤٦﴾ [الانفال: ٤٦]

“এবং তোমরা পরস্পর বিবাদ করো না, তাহলে তোমরা সাহসহারা হয়ে যাবে এবং তোমাদের শক্তি নিঃশেষ হয়ে যাবে”। [সূরা আল-আনফাল, আয়াত: ৪৬]

যদি মুজাহিদরা ঈমানের সে পর্যায়ে উঠতে পারে, তাহলে শীঘ্রই আল্লাহর প্রতিশ্রুত সাহায্য আসবে। কারণ, তিনি বলেছেন,

﴿وَكَانَ حَقًّا عَلَيۡنَا نَصۡرُ ٱلۡمُؤۡمِنِينَ ۝٤٧﴾ [الروم: ٤٧]

“আর মুমিনদের সাহায্য করাতো আমাদের কর্তব্য”। [সূরা আর-রূম, আয়াত: ৪৭]

বড় কুফর ও তার শ্রেণিবিভাগ

বড় কুফর সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে ইসলামের গণ্ডি থেকে বের করে দেয়। আর এটি হচ্ছে বিশ্বাসের ক্ষেত্রে কুফুরী। তার অনেক শ্রেণিবিভাগ রয়েছে। যেমন,

১। মিথ্যাপ্রতিপন্ন করার কুফুরী:

কুরআন ও হাদীসকে অথবা তাদের কোনো অংশকে অস্বীকার করা। কারণ, আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ ٱفْتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِٱلْحَقِّ لَمَّا جَآءَهُۥٓۚ أَلَيْسَ فِى جَهَنَّمَ مَثْوًى لِّلْكَٰفِرِينَ ﴿٦٨﴾﴾ [العنكبوت: ٦٨]

“আর সে ব্যক্তির চেয়ে যালিম আর কে, যে আল্লাহর ওপর মিথ্যা আরোপ করে অথবা তার নিকট সত্য আসার পর তা অস্বীকার করে? জাহান্নামের মধ্যেই কি কাফিরদের আবাস নয়?” [সূরা আল-'আনকাবুত, আয়াত: ৬৮]।

অন্যত্র বলেন,

﴿أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ ٱلْكِتَٰبِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍۚ ﴿٨٥﴾﴾ [البقرة: ٨٥]

“তোমরা কি কিতাবের কিছু অংশে ঈমান রাখ আর কিছু অংশ অস্বীকার কর?” [সূরা আল-বাকারা, আয়াত: ৮৫]

২৷ অহঙ্কার প্রদর্শন ও অস্বীকার করার কুফুরী:

আর তা হলো সত্যকে জেনেও গ্রহণ না করা,তার অনুসরণ না করা৷ যেমনটি করেছিল ইবলিস। এ প্রসঙ্গে পবিত্র কুরআনে উদ্ধৃত হয়েছে,

﴿وَإِذۡ قُلۡنَا لِلۡمَلَٰٓئِكَةِ ٱسۡجُدُواْ لِأٓدَمَ فَسَجَدُوٓاْ إِلَّآ إِبۡلِيسَ أَبَىٰ وَٱسۡتَكۡبَرَ وَكَانَ مِنَ ٱلۡكَٰفِرِينَ ٣٤﴾ [البقرة: ٣٤]

“আর যখন আমরা ফিরিশতাদেরকে বললাম, তোমরা আদমকে সেজদা কর৷ তখন তারা সেজদা করল, ইবলিস ছাড়া৷ সে অস্বীকার করল এবং অহংকার করল। আর সে হলো কাফিরদের অন্তর্ভুক্ত”৷ [সূরা আল-বাকারা, আয়াত: ৩৪]

৩৷ কিয়ামত সম্বন্ধে সন্দেহ বা মিথ্যা ধারণা পোষণ করা কিংবা অস্বীকার করা

এদের সম্বন্ধে আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

﴿وَمَآ أَظُنُّ ٱلسَّاعَةَ قَآئِمَةً وَلَئِن رُّدِدتُّ إِلَىٰ رَبِّي لَأَجِدَنَّ خَيۡرًا مِّنۡهَا مُنقَلَبًا ٣٦ قَالَ لَهُۥ صَاحِبُهُۥ وَهُوَ يُحَاوِرُهُۥٓ أَكَفَرۡتَ بِٱلَّذِي خَلَقَكَ مِن تُرَابٖ ثُمَّ مِن نُّطۡفَةٖ ثُمَّ سَوَّىٰكَ رَجُلٗا ٣٧﴾ [الكهف: ٣٦، ٣٧]

“আর আমি মনে করি না যে, কিয়ামত সংঘটিত হবে৷ আর আমাকে যদি ফিরিয়ে নেওয়া হয় আমার রবের কাছে, তবে নিশ্চয় আমি এর চেয়ে উত্তম প্রত্যাবর্তনস্থল পাব৷ কথায় কথায় তার সঙ্গী বলল, তুমি কি তাকে অস্বীকার করছ, যিনি তোমাকে সৃষ্টি করেছেন মাটি থেকে,

অতঃপর বীর্য থেকে, তারপর তোমাকে অবয়ব দিয়েছেন পুরুষের?” [সূরা আল-কাহাফ, আয়াত: ৩৬-৩৭]

৪। অবজ্ঞা, উপেক্ষা ও বিমুখতা প্রদর্শন করার কুফুরী

অর্থাৎ ইসলাম যা দাবী করে ও নির্দেশ দেয় তা থেকে মুখ ফিরিয়ে নেওয়া এবং তাতে বিশ্বাস স্থাপন না করা। আল্লাহ বলেন,

﴿وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ عَمَّآ أُنذِرُواْ مُعۡرِضُونَ ٣﴾ [الاحقاف: ٣]

“আর যারা কুফুরী করে, তাদেরকে যে বিষয়ে সতর্ক করা হয়েছে তা থেকে তারা বিমুখ”। [সূরা আল-আহকাফ, আয়াত: ৩]

৫। নিফাকির কুফুরী

আর তা হলো মুখে ইসলাম প্রকাশ করা, অন্তরে ও কাজে তার বিরোধিতা করা।

আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

﴿ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمۡ ءَامَنُواْ ثُمَّ كَفَرُواْ فَطُبِعَ عَلَىٰ قُلُوبِهِمۡ فَهُمۡ لَا يَفۡقَهُونَ ٣﴾ [المنافقون: ٣]

“তা এ জন্য যে, তারা ঈমান এনেছিল তারপর কুফুরী করেছিল। ফলে তাদের অন্তরসমূহে মোহর লাগিয়ে দেওয়া হয়েছে। তাই তারা বুঝতে পারছে না”। [সূরা আল-মুনাফিকুন, আয়াত: ৩]

অন্যত্র বলেন,

﴿وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَقُولُ ءَامَنَّا بِٱللَّهِ وَبِٱلۡيَوۡمِ ٱلۡأٓخِرِ وَمَا هُم بِمُؤۡمِنِينَ ۝٨﴾ [البقرة: ٨]

“আর মানুষের মধ্যে কিছু এমন আছে, যারা বলে, আমরা ঈমান এনেছি আল্লাহর প্রতি এবং শেষ দিনের প্রতি, অথচ তারা মুমিন নয়”। [সূরা আল-বাকারা, আয়াত: ৮]

৬। অস্বীকার করার কুফুরী

যেমন, কেউ ইসলাম কিংবা ঈমানের রুকনসমূহ, সালাত ইত্যাদির মতো দীনের প্রমাণিত কোনো বিষয়কে অস্বীকার করল, সালাত ত্যাগ করল। অনুরূপভাবে কোনো বিচারক কিংবা শাসনকর্তা আল্লাহর বিধানে বিচার ও শাসনকে অস্বীকার করল।

আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

﴿وَمَن لَّمۡ يَحۡكُم بِمَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ فَأُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلۡكَٰفِرُونَ ۝٤٤﴾ [المائدة: ٤٤]

“আর যারা আল্লাহ যা অবতীর্ণ করেছেন সেই মতে বিচার করে না তারা কাফির”। [সূরা আল-মায়েদা, আয়াত: ৪৪]

ইবন আব্বাস রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু বলেছেন, যে ব্যক্তি আল্লাহ যা অবতীর্ণ করেছেন তা অস্বীকার করল সে কুফুরী করল।

ছোট কুফর ও তার শ্রেণিবিভাগ

ছোট কুফর সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে ইসলাম থেকে বের করে দেয় না। যেমন,

১। নি‘আমতের কুফুরী করা

আল্লাহ তা‘আলা মুসা ‘আলাইহিস সালাম-এর কওমের মুমিনদের উদ্দেশ্য করে বলেন,

﴿وَإِذۡ تَأَذَّنَ رَبُّكُمۡ لَئِن شَكَرۡتُمۡ لَأَزِيدَنَّكُمۡۖ وَلَئِن كَفَرۡتُمۡ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٞ ٧﴾ [ابراهيم: ٧]

“আর যখন তোমাদের রব ঘোষণা দিলেন, যদি তোমরা শুকরিয়া আদায় কর, তবে আমি অবশ্যই তোমাদের বাড়িয়ে দেব আর যদি তোমরা (কুফুরী করে) অকৃতজ্ঞ হও, নিশ্চয় আমার আযাব বড় কঠিন”। [সূরা ইবরাহীম, আয়াত: ৭]

২। আমলের ক্ষেত্রে কুফুরী

আর তা হচ্ছে সে সব পাপকাজ যাকে কুরআন কিংবা হাদীসে কুফুরী বলে উল্লেখ করা হয়েছে, কিন্তু সম্পাদনকারীকে ঈমানদার বলেই বিবেচনা করা হয়।

যেমন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

«سِبَابُ المُسْلِمِ فُسُوقٌ، وَقِتَالُهُ كُفْرٌ»

“মুসলিমকে গালি দেওয়া ফাসেকী আর হত্যা করা কুফুরী”। [59]

অন্যত্র বলেছেন,

---

[59] সহীহ বুখারী, হাদীস নং ৬০৪৪, সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ৬৪।

«لاَ يَزْنِي الزَّانِي حِينَ يَزْنِي وَهُوَ مُؤْمِنٌ، وَلاَ يَشْرَبُ الخَمْرَ حِينَ يَشْرَبُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ»

“যেনাকারী যখন যেনা করে তখন সে আর মুমিন থাকে না এবং মদ্যপ যখন মদ পান করে তখন সে আর মুমিন থাকে না”।[60]

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরো বলেছেন,

«إِنَّ بَيْنَ الرَّجُلِ وَبَيْنَ الشِّرْكِ وَالْكُفْرِ تَرْكَ الصَّلَاةِ»

“বান্দা ও শির্ক-কুফরের মধ্যে পার্থক্য হচ্ছে সালাত ছেড়ে দেওয়া”। [61]

কতিপয় শরী‘আতবিদ অস্বীকার না করে অলসতাবশতঃ সালাত ত্যাগ করাকেও কুফুরী বলে মন্তব্য করেছেন। তবে সর্বসম্মত মতে সালাত ত্যাগ করা কবীরা গুনাহের অন্তর্ভুক্ত।

৩। বিচার ও শাসন পরিচালনার ক্ষেত্রে কুফুরী

যে বিচারক বা শাসনকর্তা আল্লাহ প্রদত্ত আইনে বিচার করে না, কিন্তু আল্লাহর আইনকে অস্বীকারও করে না, বরং সঠিক বলেই বিশ্বাস করে।

(তাদের এ বিচারকে কুফর বলা হয় কিন্তু এটি ছোট কুফর, যার কারণে পাপ হয় ঠিক কিন্তু ঈমান ইবনষ্ট হয় না।)

ইবন আব্বাস রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু বলেছেন, যে আল্লাহর আইনকে অস্বীকার করে সে অত্যাচারী ফাসিক। আতা রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু বলেছেন, এই কুফর বড় কুফর নয়।

---

[60] সহীহ বুখারী, হাদীস নং ২৪৭৫; সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ৫৭।

[61] সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ৮২।

তাগুত পরিহার করা অতীব জরুরি

মহান আল্লাহকে ছেড়ে যাদের ইবাদত করা হয় এবং তাতে তারা সন্তুষ্ট ও খুশী থাকে ইসলামী পরিভাষায় তাদেরকেই তাগুত বলা হয়। আল্লাহ তা‘আলা প্রতিটি যুগে অসংখ্য নবী-রাসূল প্রেরণ করেছেন এ নির্দেশ দিয়ে যে, তারা যেন লোকদের এক আল্লাহর ইবাদত ও তাগুত পরিহার করার প্রতি দাওয়াত দেয়।

আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

﴿وَلَقَدۡ بَعَثۡنَا فِي كُلِّ أُمَّةٖ رَّسُولًا أَنِ ٱعۡبُدُواْ ٱللَّهَ وَٱجۡتَنِبُواْ ٱلطَّٰغُوتَۖ ٣٦﴾ [النحل: ٣٦]

“আর আমরা অবশ্যই প্রত্যেক জাতির নিকট একজন রাসূল প্রেরণ করেছি যে, তোমরা আল্লাহর ইবাদত কর এবং তাগুতকে পরিহার কর”। [সূরা আন-নাহল, আয়াত: ৩৬]।

(ইসলামী পরিভাষায় নিম্নোক্ত ব্যক্তিদেরকেও তাগুতের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে)

১। শয়তান, যে মানুষকে আল্লাহ ব্যতীত অন্যের ইবাদতের দিকে ডাকে।

আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বলেন,

﴿أَلَمۡ أَعۡهَدۡ إِلَيۡكُمۡ يَٰبَنِيٓ ءَادَمَ أَن لَّا تَعۡبُدُواْ ٱلشَّيۡطَٰنَۖ إِنَّهُۥ لَكُمۡ عَدُوّٞ مُّبِينٞ ٦٠﴾ [يس: ٦٠]

“হে বনী আদম! আমি কি তোমাদেরকে এ মর্মে নির্দেশ দেই নি যে, তোমরা শয়তানের উপাসনা করো না। নিঃসন্দেহে সে তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু”। [সূরা ইয়াসীন, আয়াত: ৬০]

২। অত্যাচারী বিচারক, যে আল্লাহর হুকুম-আহকামকে বদলে ফেলে। ইসলামী চেতনা বিরোধী আইন প্রণয়ন করে।

নতুন শরী‘আত প্রবর্তণকারী মুশরিকদে ধিক্কার দিয়ে আল্লাহ বলেন,

﴿أَمۡ لَهُمۡ شُرَكَٰٓؤُاْ شَرَعُواْ لَهُم مِّنَ ٱلدِّينِ مَا لَمۡ يَأۡذَنۢ بِهِ ٱللَّهُۚ ٢١﴾ [الشورى: ٢١]

“তাদের জন্য কি এমন কিছু শরীক আছে, যারা তাদের জন্য দীনের বিধান দিয়েছে, যার অনুমতি আল্লাহ দেন নি?” [সূরা আশ-শূরা, আয়াত: ২১]

৩। যে সব বিচারক-শাসনকর্তা মহান আল্লাহ প্রবর্তিত আইনকে বর্তমান যুগে প্রযোজ্য নয় মর্মে ধারণা করে সেসব আইনে বিচার-শাসন পরিচালনা করে না এবং যারা কুরআন-সুন্নাহ বিরোধী আইনকে বৈধ জ্ঞান করে।

আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

﴿وَمَن لَّمۡ يَحۡكُم بِمَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ فَأُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلۡكَٰفِرُونَ ٤٤﴾ [المائدة: ٤٤]

“আর আল্লাহ যা অবতীর্ণ করেছেন যারা সেই মতে বিচার-ফায়সালা করে না তারাই কাফির”। [সূরা আল-মায়েদা, আয়াত: ৪৪]

৪। ভবিষ্যত বা অদৃশ্য সম্বন্ধে জানে বলে যারা দাবী করে।

কারণ, আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ (النمل 65)

“বল, আল্লাহ ছাড়া আসমানসমূহে ও যমীনে যারা আছে তারা গায়েব জানে না”। [সূরা আন-নামল, আয়াত: ৬৫]

৫। আল্লাহকে ছেড়ে লোকেরা যার ইবাদত করে, বিপদাপদে ডাকাডাকি করে, আর এতে সে সন্তুষ্ট ।

আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

﴿وَمَن يَقُلْ مِنْهُمْ إِنِّيٓ إِلَٰهٞ مِّن دُونِهِۦ فَذَٰلِكَ نَجْزِيهِ جَهَنَّمَۚ كَذَٰلِكَ نَجْزِي ٱلظَّٰلِمِينَ ٢٩﴾ [الانبياء: ٢٩]

“আর তাদের মধ্যে যে-ই বলবে, তিনি ছাড়া আমি ইলাহ, তাকেই আমরা প্রতিদান হিসেবে জাহান্নাব দেব; এভাবেই আমরা যালিমদের আযাব দিয়ে থাকি”। [সূরা আম্বিয়া, আয়াত: ২৯]

সুতরাং প্রতিটি মুমিনের ওপর জরুরি হলো, যাবতীয় তাগুতকে অস্বীকার ও পরিহার করা। যাতে পরিপূর্ণ মুমিন হতে পারে।

কারণ, আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

﴿فَمَن يَكۡفُرۡ بِٱلطَّٰغُوتِ وَيُؤۡمِنۢ بِٱللَّهِ فَقَدِ ٱسۡتَمۡسَكَ بِٱلۡعُرۡوَةِ ٱلۡوُثۡقَىٰ لَا ٱنفِصَامَ لَهَاۗ وَٱللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ٢٥٦﴾ [البقرة: ٢٥٦]

“সুতরাং যে ব্যক্তি তাগুতকে অস্বীকার করে এবং আল্লাহর প্রতি ঈমান আনে, অবশ্যই সে মজবুত রশি আঁকড়ে ধরে, যা ছিন্ন হবার নয়। আর আল্লাহ সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ”। [সূরা আল-বাকারা, আয়াত: ২৫৬]

উপরোক্ত আয়াত এটাই প্রমাণ করে যে, আল্লাহর ইবাদত ততক্ষণ পর্যন্ত উপকার দিবে না যতক্ষণ না তাঁকে ছেড়ে অন্যের ইবাদত করা হতে বিরত হবে। এ সম্বন্ধে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

«مَنْ قَالَ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، وَكَفَرَ بِمَا يُعْبَدُ مَنْ دُونِ اللهِ، حَرُمَ مَالُهُ، وَدَمُهُ»

“যে বলবে, আল্লাহ ছাড়া কোনো ইলাহ নেই এবং তিনি ব্যতীত যাদের ইবাদত করা হয় তাদেরকে অস্বীকার করবে, তার সম্পদ ও জীবন হারাম (নিরাপদ) বলে বিবেচিত হবে”।[62]

---

[62] সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ২৩।

নিফাকে আকবর বা বড় নিফাক

মুখে মুখে বা বাহ্য ভাষায় ইসলাম প্রকাশ আর অন্তরে কুফুরী পোষণ করাকে ইসলামী পরিভাষায় নিফাক বলে। আর এটি হচ্ছে বড় নিফাক। এর কয়েকটি শ্রেণি রয়েছে, যেমন

(১) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে মিথ্যা জ্ঞান করা (২) তিনি যা কিছু নিয়ে এসেছেন তার যে কোন একটিকে মিথ্যা জ্ঞান করা বা মন্তব্য করা (৩) রাসূলুল্লা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে শত্রুতা পোষণ করা (৪) তাঁর আনীত যে কোনো বিষয়ের সাথে শত্রুতা পোষণ করা (৫) ইসলামের ক্ষতি ও পরাজয়ে আনন্দিত হওয়া এবং (৬) ইসলামের বিজয়কে অপছন্দ ও ঘৃণা করা।

মুনাফিকদের শাস্তি কাফিরদের শাস্তি হতেও মারাত্মক হবে বলে পবিত্র কুরআন সতর্ক করেছে। আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

﴿إِنَّ ٱلْمُنَـٰفِقِينَ فِى ٱلدَّرْكِ ٱلْأَسْفَلِ مِنَ ٱلنَّارِ ١٤٥﴾ [النساء: ١٤٥]

“নিশ্চয় মুনাফিকরা জাহান্নামের সর্ব নিম্নস্তরে থাকবে”। [সূরা আন-নিসা, আয়াত: ১৪৫]

নিফাক ইসলামের জন্য মারাত্মক ক্ষতিকর, নিফাকের ক্ষতি কুফরের ক্ষতির চেয়ে কয়েকগুণ বেশি। তাইতো আমরা দেখতে পাই আল্লাহ তা‘আলা সূরা বাকারার প্রথম দিকে দুটি আয়াতের মাধ্যমে কাফিরদের অবস্থা বর্ণনা করেছেন। আর মুনাফিকদের অবস্থা বর্ণনা করেছেন ১৩টি আয়াতের মাধ্যমে। ঈমানের জন্য সর্বাধিক ক্ষতিকর এ মারাত্মক

ব্যাধিতে মানুষ বিভিন্নভাবে আক্রান্ত হচ্ছে প্রতি নিয়ত। লক্ষ্য করলে আমরা দেখতে পাব, শয়তানের ধোসর, সঠিক পথ হতে বিভ্রান্ত, সাধু-সূফী নামধারী বিভিন্ন ব্যক্তিরা ইসলামের লেবাস পরে মুসলিমদের ঈমান হরণ করছে নানা কায়দায়। তারা বাহ্যত: সালাত আদায় করে, সওম পালন করে কিন্তু নানা কৌশলে মুসলিমদের আক্বীদা নষ্ট করে। বিপদাবদে তারা আল্লাহ ব্যতীত অন্যদেরকে ডাকাডাকি করে এবং নিজ নিজ অনুসারীদেরকেও ডাকতে উৎসাহীত করে। তাদের নিকট সাহায্য প্রার্থনা করা, তাদের কবরে সেজদা দেওয়াকে পুণ্যের কাজ বলে প্রচার করে অথচ এসব কাজ ইসলামী আক্বীদা বহির্ভূত ও বড় শির্কের অন্তর্ভুক্ত। আবার কেউ কেউ প্রচার করে যে, মহান আল্লাহ সর্বত্র বিরাজমান। অথচ পবিত্র কুরআনের বহু জায়গায় বলা হয়েছে তিনি ‘আরশের ওপর আছেন। কিন্তু তারা তা অস্বীকার করে। এছাড়াও তারা কুরআনের বহু আয়াত ও সহীহ হাদীসকে পর্যন্ত নানাভাবে অস্বীকার করে।

নিফাকে আসগর বা ছোট নিফাক

অর্থাৎ বিশ্বাস ঠিক রেখে আমলের মাধ্যমে মুনাফিকী করা তথা মুনাফেকদের সদৃশ কোনো আমলে জড়িয়ে পড়া। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

«آيَةُ المُنَافِقِ ثَلاَثٌ: إِذَا حَدَّثَ كَذَبَ، وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ»

“মুনাফিকের নিদর্শন তিনটি, যখন কথা বলে মিথ্যা বলে, যখন ওয়াদা করে ভঙ্গ করে, আর আমানত রাখা হলে খিয়ানত করে”।[63]

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অন্যত্র বলেছেন,

«أَرْبَعٌ مَنْ كُنَّ فِيهِ كَانَ مُنَافِقًا خَالِصًا، وَمَنْ كَانَتْ فِيهِ خَصْلَةٌ مِنْهُنَّ كَانَتْ فِيهِ خَصْلَةٌ مِنَ النِّفَاقِ حَتَّى يَدَعَهَا: إِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ، وَإِذَا حَدَّثَ كَذَبَ، وَإِذَا عَاهَدَ غَدَرَ، وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ»

“চারটি দোষ যার মধ্যে চারটিই বিদ্যমান হবে সে নির্ভেজাল মুনাফিক বলে গণ্য হবে। আর যার মাঝে উক্ত চারটির একটি সভাব থাকবে তাহলে এটি পরিত্যাগ করা অবধি তার মধ্যে নিফাকের একটি সভাব আছে বলে ধরা হবে। যখন কথা বলে মিথ্যা বলে, প্রতিশ্রুতি দিলে ভঙ্গ করে, বিতর্ক করলে গালমন্দ করে”।[64]

এই নিফাক সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে ইসলাম থেকে বের করে না, কিন্তু তা কবীরা গুনাহ’র অন্তর্ভূক্ত। ইমাম তিরমিযি রহ. বলেছেন, বিজ্ঞ

---

[63] সহীহ বুখারী, হাদীস নং ৩৩; সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ৫৯।

[64] সহীহ বুখারী, হাদীস নং ৩৪; সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ৫৮।

আলিমদের মতে এটি আমলী নিফাক। এটাই ছিল নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগে মিথ্যার নিফাক।

আল্লাহর আউলিয়া ও শয়তানের আউলিয়া

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿أَلَآ إِنَّ أَوۡلِيَآءَ ٱللَّهِ لَا خَوۡفٌ عَلَيۡهِمۡ وَلَا هُمۡ يَحۡزَنُونَ ۝٦٢ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَكَانُواْ يَتَّقُونَ ۝٦٣﴾ [يونس: ٦٢، ٦٣]

"শুনে রাখ, নিশ্চয় আল্লাহর অলীদের কোনো ভয় নেই, আর তারা পেরেশানও হবে না। যারা ঈমান এনেছে এবং তাকওয়া অবলম্বন করত"। [সূরা ইউনুস, আয়াত: ৬২-৬৩]

উপরোক্ত আয়াত আমাদের এই শিক্ষাই দিচ্ছে যে, মুমিন-মুত্তাকি ও নিজেকে যাবতীয় পাপকাজ হতে বিরত রাখেন এমন প্রতিটি ব্যক্তিই হচ্ছেন আল্লাহর অলী। যিনি সর্বদা আপন রবকে এককভাবে ডাকেন এবং তাঁর সাথে আর কাউকে শরীক করেন না। প্রয়োজন হলে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন তাদের মাধ্যমে বিভিন্ন কারামত প্রকাশ করে থাকেন। যেমন, ঈসা 'আলাইহিস সালামের মাতা মারইয়ামের জন্য সর্বদা গায়েব হতে রিযিক আসত।

সুতরাং বেলায়াত বা অলীত্ব সত্য। কিন্তু অলী হবার জন্য শর্ত হচ্ছে তাঁকে মুমিন, আল্লাহর একান্ত অনুগত ও তাঁর একত্ববাদে বিশ্বাসী হতে হবে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আদর্শের পূর্ণ অনুবর্তন তার মাঝে থাকতে হবে। শরঈ বিধি-বিধান মান্যতার দিক

থেকে অলস ও পাপকর্মে জড়িত কোনো ফাসিক কিংবা মুশরিক ব্যক্তির মধ্যে অলীত্ব প্রকাশ পাবে, এমনটি কোনোভাবেই সত্য ও গ্রহণযোগ্য নয়। যে ব্যক্তি মুশরিকদের মত আল্লাহকে ছেড়ে অন্যের নিকট দো'আ করে, সে কেমন করে আল্লাহর সম্মানিত অলী হতে পারে? আর কারামত বাপ-দাদার নিকট থেকে ওয়ারিশ সূত্রে পাওয়ার কোনো বস্তু নয়; বরং এর সাথে ঈমান ও নেক আমল সম্পর্কযুক্ত। অনেক সময় দেখা যায়, বিদ'আতীরা তাদের শরীরে লোহা ইত্যাদি প্রবেশ করায়, আগুন গিলে খায় এবং এ জাতীয় নানা অলৌকিক কাজ প্রদর্শন করে। সেসব আসলে শয়তানের কাজ। নিজেদের স্বার্থ হাসিলের জন্য তারা ঐ ধরণের উদ্ভট কার্যকলাপ প্রদর্শন করে কারামত বলে চালিয়ে দেয়। এসব কাজের মাধ্যমে বরং তারা ক্রমান্বয়ে গোমরাহীর অতল তলে তলিয়ে যাচ্ছে। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বলেন,

﴿قُلۡ مَن كَانَ فِي ٱلضَّلَٰلَةِ فَلۡيَمۡدُدۡ لَهُ ٱلرَّحۡمَٰنُ مَدًّاۚ ٧٥﴾ [مريم: ٧٥]

"বল: যে বিভ্রান্তিতে রয়েছে তাকে পরম করুণাময় প্রচুর অবকাশ দেবেন"। [সূরা মারইয়াম, আয়াত: ৭৫]

যারা ভারতে গিয়েছেন তারা অগ্নি উপাসকদের নিকট এর চেয়েও ভয়ানক বিষয় দেখতে পেয়েছেন। যেমন, তারা তলোয়ার দিয়ে একে অপরকে আঘাত করে, তবুও তাদের কোনো ক্ষতি হয় না, অথচ তারা কাফির ও মুশরিক। ইসলাম রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তার সাহাবীরা করেন নি এমন কার্যাবলীর কোনো স্বীকৃতি দেয় না। এ জাতীয় কাজের মধ্যে যদি কোনো ফায়দা থাকত তাহলে অবশ্যই

তারা এতে অগ্রগামী থাকতেন। অনেক লোকের ধারণা, আল্লাহর অলীরা গায়েবের খবর জানেন। কিন্তু সত্যিকার্থে গায়েবের খবর একমাত্র আল্লাহর হাতে। তবে কখনও কখনও তিনি গায়েবের কোনো কোনো বিষয় তাঁর রাসূলদের জানিয়েছেন।

আল্লাহ বলেন,

﴿عَٰلِمُ ٱلۡغَيۡبِ فَلَا يُظۡهِرُ عَلَىٰ غَيۡبِهِۦٓ أَحَدًا ٢٦ إِلَّا مَنِ ٱرۡتَضَىٰ مِن رَّسُولٖ ٢٧﴾ [الجن: ٢٦، ٢٧]

"তিনি গায়েবের জ্ঞানের অধিকারী, আর তিনি তাঁর গায়েবের খবর কারো কাছে প্রকাশ করেন না। তবে তাঁর মনোনীত রাসূল ছাড়া"। [সূরা আল-জিন্ন, আয়াত: ২৬-২৭]

এই আয়াতে শুধু রাসূলদের কথা বলা হয়েছে। অন্য কারও কথা বলা হয়নি। কবরের ওপর গম্বুজ ইত্যাদি দেখলেই কেউ কেউ মনে করে থাকেন যে, এটি কোনো অলীর কবর। অথচ খোজ নিলে দেখা যায় তা হয়তো কোনো ফসিকের কবর। অথবা আদৌ ওখানে কাউকে কবরই দেওয়া হয়নি। কবরের ওপর গম্বুজ, সৌধ ইত্যাদি নির্মাণ করা ইসলাম হারাম ঘোষণা করেছে।

হাদীসে আছে:

«نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُجَصَّصَ الْقَبْرُ، وَأَنْ يُقْعَدَ عَلَيْهِ، وَأَنْ يُبْنَى عَلَيْهِ»

“রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কবর চুনকাম বা প্লাষ্টার করা, করবের উপর বসা এবং তার ওপর ঘর (বা সৌধ) নির্মাণ নিষিদ্ধ করেছেন”।[65]

মসজিদে দাফন করা হয়েছে (আর সে তা জানার পরও নিষেধ করে যায়নি) এমন ব্যক্তি কখনই অলী হতে পারে না। কারো জন্য মাজার বানানো কিংবা কবরের ওপর গম্বুজ নির্মাণ করা অলীদের কাজ হতে পারে না। কারণ, এগুলো ইসলামী শিক্ষার পরিপন্থী। মৃত ব্যক্তিদের স্বপ্নে দেখতে পাওয়াও শরী‘আতের দৃষ্টিতে অলী হবার মাপকাঠি নয়, বরং তা অনেক সময় শয়তানের ধোকাও হতে পারে।

[65] সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ৯৭০।

ঈমানের শাখাসমূহ

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

«الْإِيمَانُ بِضْعٌ وَسَبْعُونَ - أَوْ بِضْعٌ وَسِتُّونَ - شُعْبَةً، فَأَفْضَلُهَا قَوْلُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، وَأَدْنَاهَا إِمَاطَةُ الْأَذَى عَنِ الطَّرِيقِ»

“ঈমানের ৬৩ হতে ৬৯ শাখা রয়েছে। তার মধ্যে সর্বোত্তম হলো কালেমা লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ বলা। আর সর্বনিম্ন হলো, রাস্তা থেকে কষ্টদায়ক জিনিস সরিয়ে ফেলা”।[66]

ইবন হাজার আসকালানী রহ. ফতহুল বারী গ্রন্থে বলেছেন, ইবন হিব্বান যা বলেছেন তার সারমর্ম হলো- এই শাখাগুলোর শ্রেণিবিভাগ মানুষের অন্তর, জিহ্বা ও অঙ্গ প্রত্যঙ্গের আমল।

১। অন্তরের আমল হলো বিশ্বাস ও নিয়ত। এটি ২৪ ভাগে বিভক্ত।

আল্লাহর ওপর ঈমান: এর মধ্যে রয়েছে, তাঁর জাত, সিফাত ও তাওহীদের ওপর ঈমান। তিনি ছাড়া আর যা কিছু আছে তাদেরকে সৃষ্টি করা হয়েছে। সুতরাং তাদের ইবাদত না করা। যেমন, দো‘আ, সাহয্য প্রার্থনা ও এ জাতীয় অন্যান্য কাজ।

আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

“তাঁর মত কিছু নেই। আর তিনি সর্বশ্রোতা ও সর্বদ্রষ্টা”। [সূরা আশ-শূরা, আয়াত: ১১]

---

[66] সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ৩৫।

তাঁর ফিরিশতাবৃন্দ, কিতাবসমূহ, রাসূলবৃন্দ, তাকদিরের ভালো-মন্দ এবং আখিরাতের ওপর ঈমান আনা:

আখিরাতের ওপর ঈমানের অন্তর্ভুক্ত রয়েছে, কবরের সওয়াল জওয়াব, পূনরুত্থান, কবর থেকে উঠানো, হিসাব-নিকাশ, মীযান, পুলছিরাত, ও জান্নাত-জাহান্নাম।

আল্লাহর জন্য ভালোবাসা এবং শত্রুতা তাঁর কারণেই।

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে মহব্বত এবং তাঁকে সম্মান করা।

এর মধ্যে রয়েছে তাঁর ওপর দুরূদ পাঠ করা এবং তাঁর সুন্নতের অনুসরণ করা।

ইখলাস: এর মধ্যে রয়েছে, রিয়া ও নিফাক ত্যাগ করা। তাওবা করা। ভয় ও আশা করা। শুকরিয়া আদায় করা, সততা, সবর, আল্লাহর বিচারে সন্তুষ্ট থাকা এবং তাওয়াক্কুল।

রহমত ও ইবনয় নম্রতা: এর মধ্যে অন্তর্ভূক্ত হলো বড়দের সম্মান করা, ছোটদেরকে ভালোবাসা, অহংকার ও আত্মগর্ব ত্যাগ করা, হিংসা-বিদ্বেষ ও ক্রোধ ত্যাগ করা।

২। জিহ্বার আমল: এর মধ্যে সাতটি ভাগ অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। কালেমা শাহদাত পাঠ করা। কুরআন তিলাওয়াত করা, ইলম শেখা ও অন্যকে শেখানো। দো'আ, যিকর, এর মধ্যে আছে ইস্তেগফার করা ও মন্দ কথা থেকে বিরত থাকা।

৩। শরীরের আমল: এতে ৩৮ টি ভাগ রয়েছে।

ক) এর কতগুলি চোখের সাথে জড়িত, তা মোট ১৫ টি। এর মধ্যে আছে পবিত্রতা। অন্যকে খাওয়ানো। মেহমানদের একরাম করা। ফরজ ও নফল সিয়াম পালন করা। ইতিকাফ করা। লাইলাতুল কদর তালাশ করা। হজ উমরা পালন করা। বাইতুল্লাহর তাওয়াফ করা।

দীনকে জিন্দা রাখার জন্য অন্যত্র হিজরত করা, এর মধ্যে রয়েছে ঈমান বাঁচানোর তাগিদে শিরকাচ্ছন্ন দেশ থেকে হিজরত করা। নযর ও মান্নত পূর্ণ করা। কসম পূর্ণ করা, এর মধ্যে রয়েছে আল্লাহর নামে সত্য কসম করা, কাফফারা আদায় করা। যেমন, প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হলে কিংবা রমযান মাসে সাওম অবস্থায় সহবাস করলে শরী'আত নির্ধারিত কাফ্ফারা আদায় করা ইত্যাদি।

খ) এর মধ্যে যা অনুসরনের সাথে জড়িত: তা ছয়টি । বিবাহ-শাদির মাধ্যমে নিজের পবিত্রতা রক্ষা করা ও পরিবারের হক আদায় করা। মাতা-পিতার খিদমত করা। (এর মধ্যে রয়েছে তাদের কষ্ট না দেওয়া এবং বাচ্চাদের ইসলামী বিধি মত প্রতিপালন করা)। আত্মীয়দের সাথে সুসম্পর্ক বজায় রাখা। (আল্লাহর অবাধ্যতা ও পাপের কাজ ব্যতীত) নেতৃবর্গ ও শাসকদের মান্য করা। দাস-দাসী ও অধিনস্তদের সাথে সদ্ব্যবহার করা।

গ) আরো কিছু আছে যা সাধারণভাবে সকলের সাথে জড়িত: এর মধ্যে ১৭ টি ভাগ আছে। যথা, ন্যায় বিচারের সাথে আমিরের দায়িত্ব পালন করা । মুসলিমদের দলের সাথে একিভূত থাকা। হাকিমদের (রাজাদের)

মান্য করা। (তবে তারা আল্লাহর অবাধ্যতা বা পাপের হুকুম দিলে তা মান্য করা জরুরি নয়)। মানুষের মধ্যে পারস্পরিক দ্বন্দ্বের মীমাংসা করে মিলমিশ ঘটানো, (তার মধ্যে রয়েছে খারিজি ও বিদ্রোহীদের সাথে যুদ্ধ করা)। নেক ও তাকওয়ার কাজে পারস্পরিক সহযোগিতা করা, (এর মধ্যে সৎ কাজের প্রতি আদেশ ও অন্যায় কাজে বাধা প্রদান অন্তর্ভুক্ত)। হজ পালন করা। জিহাদ করা (এর মধ্যে যুদ্ধের জন্য তৈরি হওয়াও অন্তর্ভুক্ত) আমানত আদায় করা (তার মধ্যে গণিমতের এক পঞ্চমাংশ বাইতুল মালে জমা দেওয়াও অন্তর্ভুক্ত)। কর্জ আদায় করা। প্রতিবেশীর হক আদায় করা, তাকে সম্মান করা। সৎ ভাবে ব্যবসা বাণিজ্য করা (হালাল উপায়ে অর্থ উপার্জন এর অন্তর্ভুক্ত)। উপার্জিত অর্থ সৎ ও বৈধ পথে ব্যয় করা (বাহুল্য পথে খরচ না করা)। সালামের উত্তর দেওয়া । হাঁচির জবাব দেওয়া। মানুষদের কষ্ট দেওয়া থেকে বিরত থাকা। খেল-তামাশা হতে বিরত থাকা এবং রাস্তা হতে কষ্টদায়ক জিনিস সরিয়ে ফেলা।

এ হাদীস এটাই শেখাচ্ছে যে, তাওহীদ হচ্ছে ঈমানের সর্বোচ্চ ও সর্বোত্তম স্তর। সুতরাং দীনের দায়ীদের প্রথম ও প্রদান দায়িত্ব হচ্ছে, সর্বোচ্চ আমল দিয়ে দাওয়াত কর্ম শুরু করবে অতঃপর তা নিজে আমল করবে। প্রথমে ভিত্তি প্রস্তর, তারপর দেওয়াল, এরপর যেটা যত জরুরি। কারণ, তাওহীদই আরব ও আজমকে এক করেছে এবং ইসলামী রাষ্ট্র গঠনের রাস্তা তৈরি করেছে।

বিপদ দূর হয় কীভাবে?

১। মুসিবত কেন আপতিত হয় এবং আল্লাহ তা বান্দাদের থেকে উঠিয়ে নেন কীভাবে সে বিষয়ে পবিত্র কুরআন বর্ণনা করছে:

﴿ذَٰلِكَ بِأَنَّ ٱللَّهَ لَمۡ يَكُ مُغَيِّرٗا نِّعۡمَةً أَنۡعَمَهَا عَلَىٰ قَوۡمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُواْ مَا بِأَنفُسِهِمۡ ٥٣﴾ [الانفال: ٥٣]

"তা এ জন্য যে, আল্লাহ কোনো নিয়ামতের পরিবর্তনকারী নন, যা তিনি কোনো কাওমকে দিয়েছেন, যতক্ষণ না তারা পরিবর্তন করে তাদের নিজদের মধ্যে যা আছে"। [সূরা আল-আনফাল, আয়াত: ৫৩]

২। অন্যত্র আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿وَمَآ أَصَٰبَكُم مِّن مُّصِيبَةٖ فَبِمَا كَسَبَتۡ أَيۡدِيكُمۡ وَيَعۡفُواْ عَن كَثِيرٖ ٣٠﴾ [الشورى: ٣٠]

"আর তোমাদের প্রতি যে মুসিবত আপতিত হয়, তা তোমাদের কৃতকর্মেরই ফল। আর অনেক কিছুই তিনি ক্ষমা করে দেন"। [সূরা আশ-শূরা, আয়াত: ৩০]

৩। আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন,

﴿ظَهَرَ ٱلۡفَسَادُ فِي ٱلۡبَرِّ وَٱلۡبَحۡرِ بِمَا كَسَبَتۡ أَيۡدِي ٱلنَّاسِ لِيُذِيقَهُم بَعۡضَ ٱلَّذِي عَمِلُواْ لَعَلَّهُمۡ يَرۡجِعُونَ ٤١﴾ [الروم: ٤١]

“মানুষের কৃতকর্মের দরুন স্থলে ও সমুদ্রে ফাসাদ প্রকাশ পায়। যার ফলে আল্লাহ তাদের কতিপয় কৃতকর্মের স্বাদ তাদেরকে আস্বাদন করান, যাতে তারা ফিরে আসে”। [সূরা আর-রূম, আয়াত: ৪১]

৪। অন্যত্র ইরশাদ হয়েছে,

﴿وَضَرَبَ ٱللَّهُ مَثَلٗا قَرۡيَةٗ كَانَتۡ ءَامِنَةٗ مُّطۡمَئِنَّةٗ يَأۡتِيهَا رِزۡقُهَا رَغَدٗا مِّن كُلِّ مَكَانٖ فَكَفَرَتۡ بِأَنۡعُمِ ٱللَّهِ فَأَذَٰقَهَا ٱللَّهُ لِبَاسَ ٱلۡجُوعِ وَٱلۡخَوۡفِ بِمَا كَانُواْ يَصۡنَعُونَ ١١٢﴾ [النحل: ١١٢]

“আর আল্লাহ উপমা পেশ করছেন, একটি জনপদ, যা ছিল নিরাপদ ও শান্ত। সবদিক থেকে তার রিযিক তাতে বিপুলভাবে আসত। অতঃপর সে (জনপদ) আল্লাহর নি‘আমত অস্বীকার করল। তখন তারা যা করত তার কারণে আল্লাহ তাকে ক্ষুধা ও ভয়ের পোশাক পরালেন”। [সূরা আন-নাহল, আয়াত: ১১২]

৫। উপরোক্ত আয়াতসমূহ আমাদের এই শিক্ষা দিচ্ছে যে, আল্লাহ সবচেয়ে বড় ন্যায় বিচারক। তিনি কখনই কোনো জনপদের ওপর বালা-মুসিবত আপতিত করেন না, যতক্ষণ না তারা আল্লাহর বিরুদ্ধাচরণ ও পাপ করে। বিশেষ করে তাওহীদ হতে দূরে সরে যায়।

বর্তমান বিশ্বের অধিকাংশ মুসলিম দেশে নানা পাপাচার ও শির্কী আমলের প্রকাশ দেখা যাচ্ছে, যার কারণে আল্লাহর পক্ষ হতে একটার পর একটা পরীক্ষা আসছে, নানা বিপদাপদে পতিত হচ্ছে প্রতিনিয়ত। মুসলিম সমাজ শির্ক ও পাপাচার ছেড়ে আবারো আল্লাহর দিকে ফিরে

এসে ব্যক্তি ও সমাজ জীবনে শরয়ি বিধি-বিধান প্রতিষ্ঠায় উদ্যোগী না হলে মুসিবত আবর্তণের এ ধারা কখনই বন্ধ হবে না।

৬। পবিত্র কুরআন অত্যন্ত পরিষ্কার ভাষায় মুশরিকদের অবস্থা বর্ণনা করছে, যখন তাদের ওপর বিপদ আপতিত হয় তখন কায়মনোবাক্যে আল্লাহকে ডাকে। বিপদ কেটে গেলে আবারো পূর্বাবস্থায় প্রত্যাবর্তণ করে। অর্থাৎ ভালো সময়ে আল্লাহকে ছাড়া অন্যকে ডাকে। আল্লাহ তাদের সম্বন্ধে বলছেন,

﴿فَإِذَا رَكِبُواْ فِي ٱلْفُلْكِ دَعَوُاْ ٱللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ فَلَمَّا نَجَّىٰهُمْ إِلَى ٱلْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ ۝٦٥﴾ [العنكبوت: ٦٥]

“তারা যখন নৌযানে আরোহণ করে, তখন তারা একনিষ্ঠভাবে আল্লাহকে ডাকে। অতঃপর যখন তিনি তাদেরকে স্থলে পৌঁছে দেন, তখনই তারা শির্কে লিপ্ত হয়”। [সূরা আল-‘আনকাবুত, আয়াত: ৬৫]

৭। আজকাল বহু মুসলিমকে দেখা যায়, বিপদে পড়লে সাহায্যের জন্য গাইরুল্লাহকে ডাকাডাকি করে। বলে থাকে, (হে খাজা বাবা! হে বড়পীর সাহেব!)। সুসময় ও দুঃসময় উভয় অবস্থায়ই আপন রব ও রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নির্দেশের বিরোধিতা করে শির্কে প্রবৃত্ত হচ্ছে। (নাউযুবিল্লাহ)

৮। উহুদ যুদ্ধে মুসলিমদের তীরন্দাজ বাহিনী আপন নেতার (রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম) নির্দেশ অনুপুঙ্খভাবে মান্য না করার

কারণে (প্রাথমিক) পরাজয়ের শিকার হয়ে বিস্মিত হয়ে পড়েন। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন পবিত্র কুরআনে তাদের সম্বন্ধে বলেন,

﴿قُلۡ هُوَ مِنۡ عِندِ أَنفُسِكُمۡۗ ١٦٥﴾ [ال عمران: ١٦٥]

“বল, এটা তোমাদের নিজেদেরই পক্ষ হতে”। [সূরা আলে ইমরান, আয়াত: ১৬৫]

হুনাইনের যুদ্ধে কিছু সংখাক মুসলিম বললেন, আমরা অল্প হলেও হারব না। তখনই সূচিত হলো শোচনীয় পরাজয়। তাদের তিরস্কার করে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বলেন,

﴿وَيَوۡمَ حُنَيۡنٍ إِذۡ أَعۡجَبَتۡكُمۡ كَثۡرَتُكُمۡ فَلَمۡ تُغۡنِ عَنكُمۡ شَيۡـٔٗا ٢٥﴾ [التوبة: ٢٥]

“এবং হুনাইনের দিন যখন তোমাদের সংখ্যাধিক্য তোমাদেরকে উৎফুল্ল করেছিল, অথচ তা তোমাদের কোনো কাজে আসে নি”। [সূরা আত-তাওবাহ, আয়াত: ৯-২৫]

৯। উমার রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু সেনাপতি সা‘দ রাদিয়াল্লাহু ‘আনহুকে ইরাকে লিখলেন: তোমরা এমনটি বল না যে, আমাদের শত্রুরা যেহেতু আমাদের থেকে নিকৃষ্ট তাই কখনই তারা আমাদের ওপর জয়যুক্ত হতে পারবে না; বরং তারা হয়ত তাদের থেকে কোনো খারাপ জাতির ওপর জয়যুক্ত হবে। যেমনিভাবে বনী ইসরাঈলরা পাপাচারে লিপ্ত হলে কাফির অগ্নি উপাসকরা তাদের ওপর জয়যুক্ত হয়েছিল। তাই তোমরা নিজেদের জন্য আল্লাহর কাছে সাহায্য চাও পাপ হতে বেঁচে থাকার জন্য, যেমনি করে সাহায্য চাও নিজ শত্রুদের বিরুদ্ধে।

মিলাদুন্নবী

আজকাল বিশ্বের বিভিন্ন অঞ্চলে দেখা যাচ্ছে মিলাদের নাম করে নানা পাপ কাজ, বিদ‘আত ও শরী‘আত পরিপন্থি বিভিন্ন না জায়েয কাজ মহা ধুমধামে সম্পাদন করা হচ্ছে। অথচ মিলাদের এ উৎসব না রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম করেছেন, না তাঁর সাহাবীরা, না তাবেঈরা না নির্ভরযোগ্য অন্য কেউ। এ বিষয়ে শরী‘আতের কোনো দলীলও নেই।

১। মিলাদ উদযাপনকারী বহু লোকই শির্কে পতিত হয়। কারণ, এ অনুষ্ঠানে তারা বলে যে, হে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিপদ হতে উদ্ধার করুন, সাহায্য করুন। হে আল্লাহর প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম! আপনারই ওপর ভরসা, হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম! আমাদের দুঃখ কষ্ট দূর করুন, যখনই আপনাকে দেখি তখনই দুঃখ দুর হয়ে যায়। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যদি এ সব কথা শুনতেন, তাহলে অবশ্যই একে বড় শির্ক বলে আখ্যায়িত করতেন। কারণ, বিপদ মুক্তি, ভরসা ও কষ্ট-মুসিবত দূর করার ক্ষমতা একমাত্র আল্লাহ রাব্বুল আলামীনেরই আছে। এ অধিকার অন্য কারো নেই।

আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

﴿قُلۡ إِنِّي لَآ أَمۡلِكُ لَكُمۡ ضَرّٗا وَلَا رَشَدٗا ٢١﴾ [الجن: ٢١]

“বল, নিশ্চয় আমি তোমাদের জন্য না কোনো অকল্যাণ করার ক্ষমতা রাখি এবং না কোনো কল্যাণ করার”। [সূরা আল-জিন্ন, আয়াত: ২১]

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

«إذا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللهَ وَإذا اسْتَعَنْتَ فاسْتَعِنْ باللهِ»

“যখন (কিছু) চাইবে আল্লাহর কাছেই চাইবে আর যখন সাহায্য প্রার্থনা করবে আল্লাহর কাছেই প্রার্থনা করবে”।[67]

২। মিলাদের মধ্যে অতিরঞ্জন ও বাড়াবাড়ি করা হয়ে থাকে। যেমন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রশংসার ক্ষেত্রে সীমা অতিক্রম করে এমন সব কথা বলা হয় যা তিনি এই বলে নিষেধ করেছেন:

«لاَ تُطْرُونِي، كَمَا أَطْرَتْ النَّصَارَى ابْنَ مَرْيَمَ، فَإِنَّمَا أَنَا عَبْدُهُ، فَقُولُوا عَبْدُ اللَّهِ، وَرَسُولُهُ»

“তোমরা আমার ব্যাপারে সীমালঙ্ঘন কর না যেমন সীমালঙ্ঘন করেছে খৃষ্টানরা ঈসা ইবন মারইয়াম সম্বন্ধে। আমি একজন বান্দা বৈ নই। সুতরাং তোমরা বল, আল্লাহর বান্দা ও তাঁর রাসূল”।[68]

৩। মিলাদে বলা হয়, আল্লাহ তা‘আলা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে নিজ নূর হতে সৃষ্টি করেছেন এবং বাকী সব জিনিস সৃষ্টি করেছেন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নূর হতে।

এসব আক্বীদা পোষণকারীদেরকে পবিত্র কুরআন মিথ্যাবাদী বলেছে।

---

[67] তিরমিযী, হাদীস নং ২৫১৬, তিনি হাদীসটিকে হাসান সহীহ বলেছেন। আলবানী রহ. হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন।

[68] সহীহ বুখারী, হাদীস নং ৩৪৪৫।

ইরশাদ হচ্ছে,

﴿قُلۡ إِنَّمَآ أَنَا۠ بَشَرٞ مِّثۡلُكُمۡ يُوحَىٰٓ إِلَيَّ أَنَّمَآ إِلَٰهُكُمۡ إِلَٰهٞ وَٰحِدٞۖ ١١٠﴾ [الكهف: ١١٠]

“বল, আমি তোমাদের মতই একজন মানুষ। আমার নিকট ওহী প্রেরণ করা হয় যে, তোমাদের ইলাহই এক ইলাহ। আমিত তোমাদের মতই একজন মানুষ, আমার কাছে ওহী পাঠান হয় এই বলে যে, তোমাদের উপাস্য মাত্র একজন”। [সূরা আল-কাহাফ, আয়াত: ১১০]

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পিতা-মাতার মাধ্যমে জন্ম গ্রহণ করেছেন, বিষয়টি সকলেরই জানা। সুতরাং তিনিও মানুষ, কিন্তু তাঁর বিশেষত্ব হলো তাঁর কাছে ওহী পাঠান হয়েছে।

মিলাদে আরও বলা হয়ে থাকে যে আল্লাহ তা‘আলা মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কারণে দুনিয়া সৃষ্টি করেছেন।

পবিত্র কুরআন তাদের দাবীকে মিথ্যা প্রমাণ করে বলছে,

﴿وَمَا خَلَقۡتُ ٱلۡجِنَّ وَٱلۡإِنسَ إِلَّا لِيَعۡبُدُونِ ٥٦﴾ [الذاريات: ٥٦]

“আমি মানুষ ও জিন্নকে কেবল আমার ইবাদতের জন্য সৃষ্টি করেছি”। [সূরা আয-যারিয়াত, আয়াত: ৫৬]

৪। খৃষ্টানরা ঈসা আলাইহিস সালামেরর জন্মবার্ষিকী পালন করে এবং একই ধারায় নিজেদের ব্যক্তিগত জন্ম বার্ষিকীও পালন করে থাকে। তাদের থেকেই মুসলিমরা এ বিদ‘আত গ্রহণ করেছে। ফলে, তারা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্ম বর্ষিকী পালন করার প্রচলন

ঘটিয়েছে এবং সে খৃষ্টানদের অনুকরণে কেউ কেউ নিজের জন্মবার্ষিকীও পালন করে।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদেরকে সাবধান করে বলেছেন,

«مَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ»

“যে ব্যক্তি অন্য জাতির সাদৃশ্য অবলম্বন করবে সে তাদের অন্তর্ভুক্ত বলে বিবেচিত হবে”।[69]

৫। মিলাদের সময় নারী পুরুষদের একত্রে মিলিত হতে দেখা যায়, অথচ ইসলাম এরূপ সম্মেলনকে হারাম বলে ঘোষণা করেছে।

৬। মিলাদের উৎসব আয়োজন উপলক্ষ্যে সাজ সরঞ্জামের জন্য লক্ষ লক্ষ টাকা ব্যয় করা হয়। অথচ তা কোনো উপকার ছাড়াই নষ্ট হয়ে যায়। লাভ হয় শুধু অমুসলিমদের, যাদের কাছ থেকে উৎসবের রঙ্গিন কাগজ, মোমবাতি ও নানা সরঞ্জামাদি খরিদ করা হয়। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অযথা টাকা পয়সা নষ্ট করতে নিষেধ করেছেন।

৭। মানুষ এসব আনন্দ ফুর্তির মধ্যে অনেক সময় অহেতুক নষ্ট করে। এমনকি প্রায়ই তারা এ কারণে সময়মত সালাত আদায় করতে পারে না, বরং সালাত একেবারে বাদ দিয়ে দিয়েছে, এরূপ দৃশ্যও বহু দেখা গেছে।

[69] আবু দাউদ, হাদীস নং ৪০৩১।

৮। মিলাদের শেষের দিকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অনুষ্ঠানে উপস্থিত হয়েছেন ধারণা করে লোকেরা দাঁড়িয়ে যায়। শরী'আতের সুস্পষ্ট দলিলের আলোকে এ ধারণা সর্বৈবভাবে মিথ্যা, বরং নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম জীবিত থাকা অবস্থায় কেউ তাঁকে দাড়িয়ে সম্মান করুক এমনটি পছন্দ করতেন না।

আনাস রাদিয়াল্লাহু 'আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন,

«مَا كَانَ شَخْصٌ أَحَبَّ إِلَيْهِمْ مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَكَانُوا إِذَا رَأَوْهُ لَمْ يَقُومُوا لِمَا يَعْلَمُونَ مِنْ كَرَاهِيَتِهِ لِذَلِكَ»

"সাহাবায়ে কেরামের নিকট নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে অধিক প্রিয় আর কেউ ছিলেন না। তারা তাঁকে দেখতে পেলে সম্মানার্থে দাড়াতেন না। কারণ, তারা জানতেন এমনটি তিনি অপছন্দ করেন"।[70]

৯। তাদের কেউ কেউ বলে থাকে, মিলাদ মাহফিলে আমরা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবনী আলোচনা করি; কিন্তু বাস্তব ক্ষেত্রে দেখা যায়, তারা এমন সব কাজ করে যা তাঁর আদর্শের বিপরীত এবং জীবনীরও বিপরীত। তাছাড়া তাঁকে যারা ভালোবাসে তারাতো তাঁর জীবনী প্রতিটি দিনই পাঠ করে থাকে, বছরে মাত্র একবার নয়। ভালোবাসার দাবীদারদেরতো এ বিষয়টিও স্মরণে রাখা দরকার ছিল, যে রবিউল আউয়াল মাসে তাঁর জন্ম হয়, সে রবিউল আউয়াল মাসে

[70] মুসনাদ আহমদ, হাদীস নং ১২৩৪৫, আল্লামা শুয়াইব আরনাউত হাদীসটিকে মুসলিমের শর্তে সহীহ বলেছেন।

তাঁর মৃত্যুও হয়। সুতরাং এ মাসে খুশি হওয়ার চেয়ে দুঃখিত হওয়াই কি অধিক বাঞ্ছনীয় নয়? এ ক্ষেত্রে ভালোবাসার দাবী কি?

১০। মিলাদ উদযাপনকারীদের দেখা যায়, এ অনুষ্ঠান করতে গিয়ে প্রায়ই অধিক রাত পর্যন্ত তাদের জাগ্রত থাকতে হয়। ফলে, ফজরের জামাত ছুটে যায় এমনকি কখনো কখনো সালাতই ছুটে যায়।

১১। কেউ কেউ যুক্তি প্রদর্শন করে বলে যে, মিলাদ যদি নাজায়েযই হবে তাহলে এত অধিক লোক তা উদযাপন করে কীভাবে? জবাবে আমরা বলব, অধিকাংশ লোক মিলাদ উদযাপন করলেই যে তা শরী'আত সিদ্ধ হয়ে যাবে এমন কোনো কথা নেই। শরী'আতে জায়েয নাজায়েয নির্ধারিত হবে কুরআন বা সুন্নাহর দলিলের ভিত্তিতে, পালনকারী সংখ্যাধিক্যের ভিত্তিতে নয়। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿وَإِن تُطِعۡ أَكۡثَرَ مَن فِي ٱلۡأَرۡضِ يُضِلُّوكَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِۚ ۝١١٦﴾ [الانعام: ١١٦]

"যদি তুমি দুনিয়ার বেশির ভাগ লোকের অনুসরণ কর, তাহলে তারা তোমাকে আল্লাহর রাস্তা হতে বিপথগামী করে দিবে"। [সূরা আল-আন'আম, আয়াত: ১১৬]

হুযাইফা রাদিয়াল্লাহু 'আনহু বলেছেন, প্রতিটি বিদ'আতই গোমরাহী, মানুষ তাকে যতই উত্তম বলুক না কেন।

১২। সপ্তম শতাব্দীর প্রথম দিকে সিরিয়ার বাদশাহ মোজাফফর সর্বপ্রথম এ মিলাদের প্রবর্তন করে। মিশরে এর প্রচলন শুরু করে ফাতেমীরা। আল্লামা ইবন কাসীর রহ. এদেরকে কাফির ও ফাসিক বলে মন্তব্য

করেছেন। মহান আল্লাহর সাহায্য প্রার্থনা করছি, হে আল্লাহ তুমি আমাদেরকে এ বিদ‘আত হতে হিফাযত কর। (আমীন)।

আল্লাহ ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মহববত

১। আল্লাহ রাববুল আলামীন বলেন,

﴿قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ ٱللَّهَ فَٱتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ ٱللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْۚ وَٱللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ۝٣١﴾ [آل عمران: ٣١]

"বল, যদি তোমরা আল্লাহকে ভালোবাস, তাহলে আমার অনুসরণ কর, আল্লাহ তোমাদেরকে ভালোবাসবেন এবং তোমাদের পাপসমূহ ক্ষমা করে দেবেন। আর আল্লাহ অত্যন্ত ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু"। [সূরা আলে ইমরান, আয়াত: ৩১]

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

«لاَ يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ، حَتَّى أَكُونَ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ وَالِدِهِ وَوَلَدِهِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ»

"তেমাদের কেউ মুমিন বলে বিবেচিত হবে না যতক্ষণ না আমি তার কাছে তার পিতা, সন্তান ও অপরাপর সকল মানুষ অপেক্ষা অধিক প্রিয় হব"।[71]

২। এ আয়াত আমাদের শিক্ষা দিচ্ছে যে, আল্লাহ তা'আলার মহববতের সত্যায়ন একমাত্র রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আনুগত্য-অনুসরণের মাধ্যমে হবে। তিনি যা হুকুম করেছেন তা মান্য করা এবং যা করতে নিষেধ করেছেন তা ত্যাগের মাধ্যমেই সে মুহাব্বত প্রকৃত মুহাব্বত বলে স্বীকৃতি পাবে। তাঁর নির্দেশ মান্য করণ, নিষেধ পরিহার

[71] সহীহ বুখারী, হাদীস নং ১৫; সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ৪৪।

ও তাঁর সার্বিক আদর্শের অনুবর্তন ব্যতীত কেবল মুখের দাবি ভালোবাসার সত্যতা প্রমাণে যথেষ্ট নয়।

৩। উল্লিখিত সহীহ হাদীসটি আমাদেরকে শিক্ষা দিচ্ছে যে, একজন মুসলিমের ঈমান ততক্ষণ পর্যন্ত পূর্ণ হবে না, যতক্ষণ না সে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে নিজ সন্তান, মাতা-পিতা ও অন্যান্য সকল মানুষ হতে বেশি ভালোবাসবে। এমনকি (অন্য একটি হাদীসের বর্ণনা অনুযায়ী) নিজ জীবনের চেয়েও বেশি ভালোবাসবে।

অন্য সকলের চেয়ে তাঁকে বেশি ভালোবাসা হচ্ছে কি না তার প্রমাণ পাওয়া যাবে, যখন তাঁর আদেশ-নিষেধ আর নিজ নফসের চাহিদা পরস্পর বিরোধী হয় এবং সে তাঁর আদেশ-নিষেধের কাছে নিজ চাহিদাকে কোরবানি করতে পারছে, তাহলে প্রমাণ হবে যে সত্যিই সে নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামকে নিজ থেকেও অধিক ভালোবাসে। অনুরূপভাবে স্ত্রী, সন্তান, পিতা-মাতা, অপরাপর সকল মানুষের চাহিদার বিপক্ষে যদি সে নবীজীর আদর্শের অনুবর্তনের ওপর অবিচল থাকতে পারে প্রমাণ হবে সে অন্য সকলের চেয়ে নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামকেই অধিক ভালোবেসেছে। এর মাধ্যমেই প্রকৃত আশেকে নবীর পরিচয় পাওয়া যাবে। যে ব্যক্তি সকল প্রতিকুলতা ডিঙ্গিয়ে নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের আদেশ-নিষেধকে অগ্রাধিকার দিবে সেই প্রকৃত নবী প্রেমী। অন্যথা হলে প্রেমের নামে ভণ্ডামী করছে বলেই প্রমাণিত হবে।

৪। কোনো মুসলিমকে যদি জিজ্ঞেস করা হয়, তুমি কি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ভালোবাস? সাথে সাথে বলবে: হ্যাঁ,অবশ্যই, তাঁর জন্য আমার জান ও মাল কুরবান হোক। তখন যদি বলা হয়: তাহলে দাঁড়ি কাটো কেন? তাঁর হুকুমের বাইরে চল কেন? তোমার বাহ্যিক অবস্থাকে তাঁর অবস্থার সাথে মিলিয়ে নাওনা কেন? উত্তর দিবে: আরে... ভালোবাসা হচ্ছে অন্তরের মধ্যে। আলহামদু লিল্লাহ আমার অন্তর অত্যান্ত পাক পবিত্র। এসব লোকদের প্রতি আমাদের বক্তব্য হচ্ছে, তোমার অন্তর সত্যই যদি পবিত্র ও পরিচ্ছন্ন হয়, তাহলে অবশ্যই তা তোমার চেহারা ও পোষাকে প্রকাশ পাবে। কারণ, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

«أَلَا وَإِنَّ فِي الْجَسَدِ مُضْغَةً: إِذَا صَلَحَتْ صَلَحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، أَلَا وَهِيَ الْقَلْبُ»

"শোন, শরীরের ভেতরে একটি গোশত পিণ্ড আছে, যদি তা শুদ্ধ হয়ে যায় তাহলে পূর্ণ শরীর শুদ্ধ হয়ে যায়। আর যদি তা নষ্ট হয়ে যায়, তাহলে পূর্ণ শরীরই নষ্ট হয়ে যায়। শোন, সে গোশত পিণ্ড হচ্ছে কলব"।[72]

৫। (লেখক বলছেন) আমি একবার জনৈক মুসলিম ডাক্তারের চেম্বারে প্রবেশ করে দেওয়ালে পুরুষ ও মেয়েদের ছবি সাটানো দেখতে পেলাম। তাকে বললাম: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ছবি ঝুলাতে নিষেধ করেছেন। তখন সে আমাকে প্রত্যাখ্যান করল এ যুক্তি দেখিয়ে,

---

[72] সহীহ বুখারী, হাদীস নং ৫২; সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ১৫৯৯।

এরা আমার বিশ্ববিদ্যালয়ের সাথী। অথচ তার অবশ্যই জানা ছিল যে, এদের অধিকাংশই অমুসলিম-কাফের। সেসব ছবিতে এমন সব নারীর ছবিও ছিল, যাদের চুল ছিল উন্মুক্ত ও ছড়ানো। নিজ রূপ-লাবণ্যকে তারা প্রকাশ করে রেখেছিল এবং তারা প্রত্যেকেই কম্যুনিষ্ট দেশের নাগরিক। এই ডাক্তার দাড়ি কাটতো। আমি তাকে উপদেশ দিয়ে বললাম: এতে গুনাহ হয়। সে বলল: মৃত্যু পর্যন্তও আমি দাঁড়ি রাখব না। তবে বড়ই বিস্ময়কর ব্যাপার হচ্ছে, সে ডাক্তার নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি ভালোবাসার দাবী করে বলছে, হে আল্লাহর রাসূল! আমি আপনার সীমার মধ্যে প্রবেম করেছি। মনে মনে বললাম: তুমি তাঁর হুকুম অমান্য করছ তারপর বলছ তাঁর সীমার মধ্যে প্রবেশ করেছ। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কি এ জাতীয় শির্কে খুশি হন?

আমরা ও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর হিফাযতে।

৬। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি ভালোবাসার বহি:প্রকাশ মিলাদ এবং শরী'আতের চেতনা বিরোধী বাড়াবাড়ি ও মিথ্যা সর্বস্ব না'ত পড়ার মধ্যেই সীমিত নয়। বরং ভালোবাসার প্রকৃত প্রমাণ হচ্ছে তাঁর দিক নির্দেশনা মত চলা, তাঁল সুন্নতকে আঁকড়ে ধরা এবং তাঁর শিক্ষা জীবনের সর্ব অংশে ফুটিয়ে তোলা।

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওপর দুরূদের ফযীলত

আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

﴿إِنَّ ٱللَّهَ وَمَلَٰٓئِكَتَهُۥ يُصَلُّونَ عَلَى ٱلنَّبِيِّۚ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ صَلُّواْ عَلَيۡهِ وَسَلِّمُواْ تَسۡلِيمًا ٥٦﴾ [الاحزاب: ٥٦]

“নিশ্চয় আল্লাহ (ঊর্ধ্ব জগতে ফিরিশতাদের মধ্যে) নবীর প্রশংসা করেন এবং তাঁর ফিরিশতাগণ নবীর জন্য দোআ করে। হে মুমিনগণ, তোমরাও নবীর ওপর দুরূদ পাঠ কর এবং তাকে যথাযথভাবে সালাম জানাও”। [সূরা আল-আহযাব, আয়াত: ৫৬]

ইমাম বুখারী রহ. আবুল আলীয়া থেকে বর্ণনা করেছেন, আল্লাহ তা‘আলার সালাত হচ্ছে মালাইকাদের কাছে তাঁর প্রশংসা করা আর মালাইকাদের দুরূদ হচ্ছে দো‘আ।

ইবন আব্বাস রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু বলেন, দুরূদ পাঠ করার অর্থ হলো বরকত পাঠান।

এই আয়াতের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে ইবন কাসীর রহ. বলেছেন, নিশ্চয় আল্লাহ তার নিকটতম মালাইকাদের কাছে তাঁর বান্দার সম্মান ও নবী সম্বন্ধে জানাচ্ছেন। এই বলে যে, তিনি তার প্রশংসা করেন মালাইকাদের কাছে। আর মালাইকারাও তার জন্য দো‘আ করেন। এরপর আল্লাহ দুনিয়াবাসীদের হুকুম করেছেন তাঁর ওপর দুরূদ পাঠ করার জন্য, যাতে তাঁর ওপর সমস্ত বিশ্ববাসীর প্রশংসা একত্রিত হয়।

১। এই আয়াতে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন আমাদের হুকুম করেছেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্য দো'আ করতে এবং তাঁর ওপর সালাম পাঠ করতে। তিনি আল্লাহকে ছেড়ে তাঁর কাছে দো'আ চাইতে, অথবা তাঁর ওপর সূরা আল-ফাতিহা পাঠ করতে বলেন নি। অথচ অনেকে তা-ই করে থাকে।

২। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজ সাহবীদেরকে শেখানো দুরূদই সর্ব শ্রেষ্ঠ দুরূদ, তারা তাঁর নিকট কীভাবে দুরূদ পড়ব মর্মে জানতে চাইলে তিনি বলেন,

«قُولُوا: اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَأَزْوَاجِهِ وَذُرِّيَّتِهِ، كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ، وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَأَزْوَاجِهِ وَذُرِّيَّتِهِ، كَمَا بَارَكْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ»

“বল: হে আল্লাহ! মুহাম্মাদের ওপর শান্তি বর্ষণ কর এবং তার আহালের ওপর যেমন তুমি ইবরাহীম এবং তার বংশধরদের ওপর শান্তি বর্ষণ করেছিলে। নিশ্চয় তুমি উত্তম প্রশংসিত, সম্মানিত। হে আল্লাহ! মুহাম্মাদ এবং তার বংশধরদের ওপর বরকত পাঠাও, যেমন ইবরাহীম এবং তার বংশধরদের ওপর বরকত পাঠিয়েছিলে। নিশ্চয় তুমি উত্তম প্রশংসিত ও সম্মানিত”।[73]

৩। এখানে একটি বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য করা প্রয়োজন যে, উল্লিখিত এ দুরূদ অনুরূপ অন্যান্য হাদীসে যেসব দুরূদ বর্ণিত হয়েছে তার কোনোটিতেই সাইয়্যেদ শব্দটি নেই। সুতরাং দুরূদ পড়ার সময়

[73] সহীহ বুখারী, হাদীস নং ৩৩৬৯; সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ৪০৫।

সাইয়্যেদ যুক্ত না করে পড়াই উত্তম। তবে হ্যাঁ তিনি অবশ্যই আমাদের সাইয়্যেদ বা নেতা; কিন্তু দুরূদ পাঠ একটি ইবাদত আর ইবাদতের ক্ষেত্রে কুরআন ও হাদীসের অনুপুঙ্খ অনুবর্তন জরুরি এবং কুরআন সুন্নাহর ওপরই ইবাদত প্রতিষ্ঠিত। নিজ রায়ের ওপর নয়।

৪। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

«إِذَا سَمِعْتُمُ الْمُؤَذِّنَ، فَقُولُوا مِثْلَ مَا يَقُولُ ثُمَّ صَلُّوا عَلَيَّ، فَإِنَّهُ مَنْ صَلَّى عَلَيَّ صَلَاةً صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ بِهَا عَشْرًا، ثُمَّ سَلُوا اللهَ لِيَ الْوَسِيلَةَ، فَإِنَّهَا مَنْزِلَةٌ فِي الْجَنَّةِ، لَا تَنْبَغِي إِلَّا لِعَبْدٍ مِنْ عِبَادِ اللهِ، وَأَرْجُو أَنْ أَكُونَ أَنَا هُوَ، فَمَنْ سَأَلَ لِي الْوَسِيلَةَ حَلَّتْ لَهُ الشَّفَاعَةُ»

"যখন তোমরা মুয়াজ্জিনকে আযান দিতে শোন, সে যা বলে তোমরাও তাই বল। তারপর আমার ওপর দুরূদ পাঠ কর। কারণ, যে আমার ওপর একবার দুরূদ পাঠ করবে, আল্লাহ তার ওপর দশবার রহমত প্রেরণ করবেন। অতঃপর আল্লাহর কাছে আমার জন্য ওসীলা প্রার্থনা কর। এটি জান্নাতের একটি বিশেষ সম্মানিত স্থান যা কেবল আল্লাহর বিশেষ বান্দার জন্য প্রযোজ্য, আমি আশা করছি আমিই যেন সেই বিশেষ বান্দা হই। সুতরাং যে ব্যক্তি আমার জন্য ওসীলা প্রার্থনা করবে তার জন্য শাফায়াত অবধারিত হয়ে যাবে"।[74]

আযানের পর ওসীলা প্রার্থনার যে দো'আ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণিত হয়েছে, তা হলো,

[74] সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ৩৮৪।

«اللَّهُمَّ رَبَّ هَذِهِ الدَّعْوَةِ التَّامَّةِ، وَالصَّلاَةِ القَائِمَةِ آتِ مُحَمَّدًا الوَسِيلَةَ وَالفَضِيلَةَ، وَابْعَثْهُ مَقَامًا مَحْمُودًا الَّذِي وَعَدْتَهُ، حَلَّتْ لَهُ شَفَاعَتِي يَوْمَ القِيَامَةِ»

"হে আল্লাহ! তুমিই এই পরিপূর্ণ দাওয়াতের এবং প্রতিষ্ঠিত সালাতের রব। মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দান কর ওসীলা ও ফযীলাত এবং অধিষ্ঠিত কর প্রশংসিত স্থানে যার প্রতিশ্রুতি তুমি তাঁকে দিয়েছ"।[75]

৫। প্রতিটি দো'আর ক্ষেত্রেই নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওপর দুরূদ পাঠ করা জরুরি। কারণ, হাদীসে এসেছে,

«كُلُّ دُعَاءٍ مَحْجُوبٌ حَتَّى يُصَلِّيَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ»

"প্রত্যেক দো'আই বাধাগ্রস্ত থাকে, যতক্ষণ না আমার ওপর দুরূদ পাঠ করা হয়"।[76]

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরো বলেছেন,

«إِنَّ لِلَّهِ مَلَائِكَةً سَيَّاحِينَ فِي الْأَرْضِ يُبَلِّغُونِي مِنْ أُمَّتِي السَّلَامَ»

"পৃথিবী জুড়ে ঘুরে বেড়ানো আল্লাহর একদল ফিরিশতা রয়েছে। তারা আমার কাছে প্রেরিত আমার উম্মতের সালাম পৌঁছে দেয়"।[77]

---

[75] সহীহ বুখারী, হাদীস নং ৬১৪।

[76] আল-'মুজাম আল আওসাত, হাদীস নং ৭১২, ইমাম হাইসামী রহ. বলেছেন, হাদীসটি ইমাম তাবরানী আল-'মুজাম আল আওসাত এ বর্ণনা করেছেন এবং সনদের রাবীরা সবাই সিকাহ, দেখুন, মাজমা'উজ্জাওয়ায়েদ, ১০/১৬০।

[77] সুনান নাসাঈ, হাদীস নং ১২৮২, আলবানী রহ. হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন।

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওপর দুরূদ পাঠ করা অত্যন্ত ফযীলতের কাজ, বিশেষ করে জুমু‘আর দিন। দুরূদ আল্লাহর নিকটবর্তীকারী আমলের একটি। দুরূদকে ওসীলা বানানো শরী‘আত অনুমোদিত। কারণ, দুরূদ নেক আমলের অন্তর্ভুক্ত। দুরূদকে ওসীলা বানানোর পদ্ধতি যেমন এরূপ বলা যে, হে আল্লাহ! তোমার রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওপর দুরূদের ওসীলায় আমার বিপদ দূর কর।

বিদ‘আতী দুরূদ

আজকাল লোক মুখে নানা ধরণের দুরূদ শুনতে পাওয়া যায়। যা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অথবা তাঁর সাহাবীগণ হতে বর্ণিত হয় নি। না তাবেঈনগণ এর সমর্থন করেছেন না প্রসিদ্ধ ইমাম চতুষ্ট। বরং এসব দুরূদ নির্ভরযোগ্য তিন যুগের পরবর্তী যুগের কিছু লোকের বানানো। এগুলো সর্ব সাধারণ ও কতিপয় আলিমদের মধ্যে বহুল প্রচলিত। তারা এগুলো রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে প্রমাণিত দরূদের চেয়েও অধিক হারে পাঠ করে। আমার ধারণায় অনেকেই সহীহ দুরূদকে ছেড়ে দিয়েছে এবং বুজুর্গানের নামে তৈরি এ দুরূদগুলোকে প্রচার করছে। গভীর মনোযোগ দিয়ে খুব সুক্ষ্মভাবে এ সমস্ত দুরূদের প্রতি লক্ষ্য করলে দেখতে পাব যে, এগুলো নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রদর্শিত রাস্তার বিপরীত। যেমন, হে আল্লাহ! সে নবীর ওপর শান্তি বর্ষণ কর, যিনি অন্তরের শান্তি ও তার ঔষধ, শরীরের সুস্থতা ও তার শেফা, চোখের নূর ও তার আলো। অথচ শরীর, অন্তর ও চোখের রোগ উপশমকারী ও সুস্থতা দানকারী কেবলমাত্র আল্লাহ তা‘আলা। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামতো তাঁর নিজের ভালো-মন্দ করার ক্ষমতাই পর্যন্ত রাখতেন না। আল কুরআনে বর্ণিত আছে:

﴿قُل لَّآ أَمۡلِكُ لِنَفۡسِي نَفۡعٗا وَلَا ضَرًّا إِلَّا مَا شَآءَ ٱللَّهُۚ ١٨٨﴾ [الاعراف: ١٨٧]

“বল, আমিতো আল্লাহর ইচ্ছা ছাড়া আমার নিজের ভালো ও মন্দ করার ক্ষমতাও রাখি না”। [সূরা আল-আ‘রাফ, আয়াত: ১৮৮]।

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

«لاَ تُطْرُونِي، كَمَا أَطْرَتْ النَّصَارَى ابْنَ مَرْيَمَ، فَإِنَّمَا أَنَا عَبْدُهُ، فَقُولُوا عَبْدُ اللَّهِ، وَرَسُولُهُ»

“তোমরা আমার ব্যাপারে সীমালঙ্ঘন কর না যেমন সীমালঙ্ঘন করেছে খৃষ্টানরা ঈসা ইবন মারইয়াম সম্বন্ধে। আমি একজন বান্দা বৈ নই। সুতরাং তোমরা বল, আল্লাহর বান্দা ও তাঁর রাসূল”।[78]

২। অন্য একটি পাওয়া যায় যাতে বলা হয়েছে: সালাত ও সালাম আপনার ওপর হে আল্লাহর রাসূল! আমার অবস্থা সংকীর্ণ হয়ে গেছে তাই আমাকে উদ্ধার করুন হে আল্লাহর দোস্ত। এর প্রথম অংশে কোনো সমস্যা নেই, কিন্তু শেষ অংশ শির্কযুক্ত।

কারণ আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

﴿أَمَّن يُجِيبُ ٱلۡمُضۡطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكۡشِفُ ٱلسُّوٓءَ﴾ [النمل: ٦٢]

“অথবা কে বিপদগ্রস্তের ডাকে সাড়া দেয়- যখন সে তাকে ডাকে এবং বিপদ হতে উদ্ধার করে”। [সূরা আন-নামল, আয়াত: ৬২]

অন্যত্র বলেন,

﴿وَإِن يَمۡسَسۡكَ ٱللَّهُ بِضُرّٖ فَلَا كَاشِفَ لَهُۥٓ إِلَّا هُوَۖ ١٧﴾ [الانعام: ١٧]

“আর যদি আল্লাহ তোমাকে কোনো দুর্দশা দ্বারা স্পর্শ করেন, তবে তিনি ছাড়া তা দূরকারী কেউ নেই”। [সূরা আল-আন‘আম, আয়াত: ১৭]

---

[78] সহীহ বুখারী, হাদীস নং ৩৪৪৫।

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজে দুঃখ, দুশ্চিন্তায় আপতিত হলে বলতেন:

«يَا حَيُّ يَا قَيُّومُ بِرَحْمَتِكَ أَسْتَغِيثُ».

"হে চিরঞ্জীব! হে চিরস্থায়ী, তোমার দয়ার দ্বারা বিপদ উদ্ধার চাচ্ছি।[79]

সুতরাং রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিপদে আমাদের উদ্ধার করেন ও বাঁচান, এমন সব অসাড় কথা আমরা কীভাবে বলি? এটি রাসূলের সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নির্দেশিত বাণীর সম্পূর্ণ পরিপন্থী। তিনি বলেছেন,

«إذا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللهَ وَاذا اسْتَعَنْتَ فاسْتَعِنْ باللهِ»

"যখন (কিছু) চাইবে আল্লাহর কাছেই চাইবে আর যখন সাহায্য প্রার্থনা করবে আল্লাহর কাছেই প্রার্থনা করবে"।[80]

আস-সালাতুন্নারিয়া (দুরূদে নারিয়া)

এ ধরণের দুরূদ বহু মানুষের নিকট অতি পরিচিত। এর ফযিলত সম্পর্কে বলা হয়, যে ব্যক্তি এ দুরূদ ৪৪৪৪ বার পাঠ করবে সে সব রকম বালা-মুসিবত থেকে নিরাপদে থাকবে এবং তার যে কোনো ধরণের অভাব-অভিযোগ পুরণ হবে। কুরআন ও সহীহ হাদীসের

---

[79] তিরমিযী, হাদীস নং ৩৫২৪, তিনি হাদীসটিকে গরীব বলেছেন।

[80] তিরমিযী, হাদীস নং ২৫১৬, তিনি হাদীসটিকে হাসান সহীহ বলেছেন। আলবানী রহ. হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন।

আলোকে এ সব বাতিল ধারণা। এর পক্ষে কোনো সহীহ দলীল-প্রমাণ নেই।

এ দরূদের প্রতি ভালোভাবে লক্ষ্য করলে কিংবা সঠিকভাবে বিশ্লেষণ করলে দেখতে পাব যে, এটি শির্কী কথা-বার্তায় পূর্ণ। যেমন,

«اَللَّهُمَّ صلِّ صَلاةً كَامِلَةً وَسَلِمْ سَلامَا تَامًّا عَلى سَيِّدِناَ مُحَمَّدٍ الَّذِي تَنْحَلُّ بِهِ الْعُقَدُ وَتَنْفَرِجُ بِهِ الْكُرَبُ وَتَقْضِي بِهِ الْحَوَائِجُ وَتَنَالُ بِهِ الرَّغَائِبُ وَحَسُنَ الْخَواتِيْمُ وَيُسْتَسقَي الغَمَامُ بِوَجْهِهِ الْكَرِيْمُ وَعَلى آلِهِ وَصَحْبِهِ عَدَدَ كُلِّ مَعْلُومٍ لَكَ».

“হে আল্লাহ! আমাদের নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওপর পরিপূর্ণ দুরূদ ও সালাম অবতীর্ণ করুন, যার মাধ্যমে কঠিন বিপদ-আপদ থেকে উদ্ধার পাওয়া যায় এবং সব ধরণের বালা-মুসিবত দূর হয়ে যায়। যার মাধ্যমে সব ধরণের হাজত পূর্ণ হয়। তার মাধ্যমেই সমস্ত আশা আকাংখা বাস্তবায়িত হয়। তার কারণেই (ঈমান অবস্থায় মানুষের) শুভমৃত্যু নসিব হয়। তাঁর সম্মানিত চেহারার ওসীলায় বৃষ্টিপাত হয়। তাঁর পরিজন ও সাহাবীদের ওপর সে পরিমাণ দুরূদ ও সালাম প্রেরণ করুন যে পরিমাণ আপনার জানা আছে”। (নাউযুবিল্লাহ)।

১। পবিত্র কুরআন থেকে আমরা যে তাওহীদের শিক্ষা পেয়েছি, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের যে আকিদাহ শিক্ষা দিয়েছেন, তার মাধ্যমে প্রতিটি মুসলিমের এমন বিশ্বাসই পেষণ করা জরুরি যে, মানুষের ওপর আপতিত বিপদাপদ, বালা-মুসিবত দূর করার মালিক একমাত্র আল্লাহ তা‘আলা। সর্ব প্রকার প্রয়োজন পুরণ করার মালিকও তিনিই। দো‘আ কবুল করার এখতিয়ারও তাঁরই হাতে। কোনো

মুসলিমের পক্ষেই আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো কাছে দুঃখ পেরেশানী অথবা অসুস্থতা দূর করার জন্য দো'আ করার অনুমতি নেই। হোন না তিনি আল্লাহর নিকটবর্তী কোনো ফিরিশতা কিংবা সম্মানিত কোনো রাসূল। মহা গ্রন্থ আল-কোরআনে আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো কাছে দো'আ করতে নিষেধ করা হয়েছে।

তার প্রমাণ নিম্ন বর্ণিত আয়াত:

﴿قُلِ ٱدۡعُواْ ٱلَّذِينَ زَعَمۡتُم مِّن دُونِهِۦ فَلَا يَمۡلِكُونَ كَشۡفَ ٱلضُّرِّ عَنكُمۡ وَلَا تَحۡوِيلًا ٥٦ أُوْلَٰٓئِكَ ٱلَّذِينَ يَدۡعُونَ يَبۡتَغُونَ إِلَىٰ رَبِّهِمُ ٱلۡوَسِيلَةَ أَيُّهُمۡ أَقۡرَبُ وَيَرۡجُونَ رَحۡمَتَهُۥ وَيَخَافُونَ عَذَابَهُۥٓۚ إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ كَانَ مَحۡذُورٗا ٥٧﴾ [الاسراء: ٥٦، ٥٧]

"বল, 'তাদেরকে ডাক, আল্লাহ ছাড়া তোমরা যাদেরকে (উপাস্য) মনে কর। তারা তো তোমাদের দুঃখ-দুর্দশা দূর করার ও পরিবর্তন করার ক্ষমতা রাখে না। তারা যাদেরকে ডাকে, তারা নিজেরাই তো তাদের রবের কাছে নৈকট্যের মাধ্যমে অনুসন্ধান করে যে, তাদের মধ্যে কে তাঁর নিকটতর? আর তারা তাঁর রহমতের আশা করে এবং তাঁর আযাবকে ভয় করে। নিশ্চয় তোমার রবের আযাব ভীতিকর"। [সূরা আল-ইসরা, আয়াত: ৫৬-৫৭]

বিখ্যাত তাফসীর বেত্তাগণ বলেছেন, এ আয়াত সেসব ব্যক্তিদের উদ্দেশ্যে নাযিল হয়েছে, যারা মসিহ ইবন মারইয়াম-ঈসা 'আলাইহিস সালামের নিকট অথবা ফিরিশতা কিংবা নেককার জিন্নদের নিকট দো'আ করত।

২। তিনিই কঠিন কাজ ও বিপদ হতে উদ্ধার করতে পারেন' এসব কথা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কীভাবে গ্রহণ করতে পারেন। কীভাবেই বা এসবের ওপর সন্তুষ্ট থাকতে পারেন? অথচ পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে:

﴿قُل لَّآ أَمۡلِكُ لِنَفۡسِي نَفۡعٗا وَلَا ضَرًّا إِلَّا مَا شَآءَ ٱللَّهُۚ وَلَوۡ كُنتُ أَعۡلَمُ ٱلۡغَيۡبَ لَٱسۡتَكۡثَرۡتُ مِنَ ٱلۡخَيۡرِ وَمَا مَسَّنِيَ ٱلسُّوٓءُۚ إِنۡ أَنَا۠ إِلَّا نَذِيرٞ وَبَشِيرٞ لِّقَوۡمٖ يُؤۡمِنُونَ ١٨٨﴾ [الاعراف: ١٨٧]

"বল, আমি আমার নিজের ভালো কিংবা মন্দের মালিক নই, তবে আল্লাহ যা চান। আমি যদি গায়েবের খবর জানতামই, তাহলে কল্যাণ অনেক বেশি অর্জন করতে পারতাম আর কোনো অনিষ্টই আমাকে স্পর্শ করতে পারত না। আমি তো কেবল একজন ভীতি প্রদর্শক ও সুসংবাদদাতা সে কওমের জন্য যারা ঈমান এনেছে"। [সূরা আল-আ'রাফ, আয়াত: ১৮৮]

হাদীসে বর্ণিত হয়েছে, একদা এক ব্যক্তি এসে রাসূলুল্লাহকে উদ্দেশ্য করে বলল,

«مَا شَاءَ اللهُ وَشِئْتَ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَجَعَلْتَنِي لِلَّهِ عَدْلًا؟ قُلْ: مَا شَاءَ اللهُ وَحْدَهُ»

“আল্লাহ যা চান ও আপনি যা চান। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন: তুমি কি আমাকে আল্লাহর সমকক্ষ বানিয়ে ফেলছ? বরং বল, এককভাবে আল্লাহ যা চান”।[81]

৩। মানুষের বানানো ভুলে ভরা এসব দুরূদ আমরা কেন পাঠ করব? রাসূলুল্লাহ হতে বর্ণিত (যা আমরা সালাতে পাঠ করে থাকি) অধিক সওয়াব যোগ্য দুরূদ পাঠ করতে আমাদের বাধা কোথায়?

[81] সুনান নাসাঈ, হাদীস নং ১০৭৫৯।

কুরআন জীবিতদের জন্য- মৃতদের জন্য নয়

আল্লাহ তা'আলা এ সম্বন্ধে বলেন,

﴿كِتَٰبٌ أَنزَلۡنَٰهُ إِلَيۡكَ مُبَٰرَكٞ لِّيَدَّبَّرُوٓاْ ءَايَٰتِهِۦ وَلِيَتَذَكَّرَ أُوْلُواْ ٱلۡأَلۡبَٰبِ ٢٩﴾ [ص: ٢٩]

"আমরা তোমার প্রতি নাযিল করেছি এক বরকতময় কিতাব, যাতে তারা এর আয়াতসমূহ নিয়ে গভীরভাবে চিন্তা করে এবং যাতে বুদ্ধিমানগণ উপদেশ গ্রহণ করে"। [সূরা সোয়াদ, আয়াত: ২৯]

সাহাবীগণ কুরআনের হুকুম ও নিষেধের ওপর আমল করতেন। একে অপরের সাথে প্রতিযোগিতা করতেন। ফলে তারা দুনিয়া ও আখিরাতের মধ্যে সৌভাগ্যশালী হয়েছিলেন। যখন থেকে মুসলিমরা এই কুরআনের শিক্ষা ও আমলকে ত্যাগ করে তাকে মৃতদের জন্য ও দুঃখ-দুর্দশা লাঘবের জন্য ব্যবহার করতে শুরু করল, তখন থেকেই তাদেরকে অপমান ও লাঞ্ছনা স্পর্শ করল এবং তাদের মধ্যে বিভেদের সৃষ্টি শুরু হলো। তাদের ক্ষেত্রে সত্যিই আল্লাহর নিম্নোক্ত বাণী প্রযোজ্য,

﴿وَقَالَ ٱلرَّسُولُ يَٰرَبِّ إِنَّ قَوۡمِي ٱتَّخَذُواْ هَٰذَا ٱلۡقُرۡءَانَ مَهۡجُورٗا ٣٠﴾ [الفرقان: ٣٠]

"আর রাসূল বলবে, হে আমার রব! নিশ্চয় আমার জাতি এ কুরআনকে পরিত্যাজ্য জ্ঞান করেছে"। [সূরা আল-ফুরকান, আয়াত: ৩০]

আল্লাহ তা'আলা একে অবতীর্ণ করেছেন জীবিতদের জন্যই। যাতে তারা তাদের জীবদ্দশায় তার ওপর আমল করতে পারে। তা মৃতদের জন্য নয়। কারণ, তাদের আমলের রাস্তা বন্ধ হয়ে গেছে। ফলে তারা আর তা

পাঠ করতেও পারে না, আমলও করতে পারে না। কুরআন পাঠ করার কোনো সওয়াবও তাদের কাছে পৌঁছায় না। একমাত্র তার নেক সন্তানদের পাঠ করা ব্যতীত। কারণ, সে তার ঔরসজাত সন্তান। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

«إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ: إِلَّا مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ، أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ، أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ»

"মানুষ মারা গেলে তিনটি ব্যতীত তার সকল আমল বন্ধ হয়ে যায়, (সে তিনটি আমল হচ্ছে) সদকায়ে জারিয়া, এমন ইলম যার দ্বারা উপকৃত হওয়া যায় এবং নেক সন্তান যে তার জন্য দো'আ করে"।[82]

আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বলেন,

﴿وَأَن لَّيۡسَ لِلۡإِنسَٰنِ إِلَّا مَا سَعَىٰ ٣٩﴾ [النجم: ٣٩]

"আর মানুষ যা চেষ্টা করে তাই সে পায়"। [সূরা নাজম: ৩৯ আয়াত]।

ইবন কাসীর রহ. তার তাফসীরে বলেন, তার ওপর অন্যের পাপ যেমন অর্পিত হবে না, তেমনি অপরের সাওয়াবও সে পাবে না।

এই আয়াত থেকে ইমাম শাফেঈ রহ. প্রমাণ বের করেন যে, কুরআন তেলাওয়াত করে তার সওয়াব মৃত্যুদের নামে উৎসর্গ করলে তা তাদের নিকট পৌঁছে না। কারণ, উহা তাদের আমল নয় অথবা উপার্জনও নয়। এই কারণে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এটাকে উম্মতের জন্য

---

[82] সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ১৬৩১।

সুন্নত বানিয়ে যান নি, কিংবা তাদেরকে এ ব্যাপারে উৎসাহিতও করেন নি অথবা সাহাবীগণ কেউ এ ব্যাপারে কিছুই বলেন নি। যদি এটা ভালো কাজ হত তাহলে অবশ্যই তারা তা করতেন।

দো'আ, সদকা বা দান খয়রাতের সাওয়াব পৌঁছবে, এ ব্যাপারে কোনো মতবিরোধ নেই এবং এর দলীলও আছে।

১। আজ মৃত ব্যক্তির নিকট বসে কুরআন তিলাওয়াত করা একটা রসমে পরিণত হয়েছে। এমনকি কোনো বাড়ি থেকে কয়েকজনের মিলিত তিলাওয়াত শুনলে বুঝা যায় যে কেউ সেখানে মারা গেছে। যদি রেডিওতে সারাদিন কুরআন তেলাওয়াত শুনা যায় তাহলে বুঝতে হবে যে, কোনো নেতা মারা গেছে। (লেখক বলেন) একবার কোনো এক ব্যক্তি এক অসুস্থ বাচ্চাকে দেখতে যেয়ে কুরআন তিলাওয়াত করেন। তা শোনামাত্র বাচ্চার মা চেঁচিয়ে উঠে বলে: আমার বাচ্চাত এখনো মারা যায় নি, তাহলে তুমি কুরআন তেলাওয়াত করছ কেন?

২। যে ব্যক্তি জীবিত অবস্থায় সালাত ত্যাগ করেছে, তার জন্য মৃত্যুর পর কুরআন পাঠ করলে তার কি লাভ হবে? কারণ, তাকে তো আগেই আযাবের খবর দেওয়া হয়েছে।

﴿فَوَيۡلٞ لِّلۡمُصَلِّينَ ٤ ٱلَّذِينَ هُمۡ عَن صَلَاتِهِمۡ سَاهُونَ ٥﴾ [الماعون: ٤، ٥]

"অতএব সেই সালাত আদায়কারীদের জন্য দুর্ভোগ, যারা নিজেদের সালাতে অমনোযোগী"। [সূরা আল-মাউন, আয়াত: ৪-৫]

৩। তোমরা মৃতদের ওপর সূরা ইয়াসীন পাঠ কর' মর্মে যে হাদীস বর্ণনা করা হয়, সেটি সহীহ নয় বরং মওদু' বা জাল। মুহাদ্দিস দারা কুতনী বলেছেন, এর সনদ দুর্বল এবং মূল বক্তব্যও দুর্বল।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বা তাঁর সাহাবীদের কেউ মৃতের ওপর কুরআন পাঠ করেছেন এমন কোনো প্রমাণ নেই। তারা না সূরা ইয়াসিন পাঠ করেছেন না সূরা ফাতেহা কিংবা কুরআনের অন্য কোনো অংশ; বরং নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর সাহাবীদের বলতেন:

«اسْتَغْفِرُوا لِأَخِيكُمْ، وَسَلُوا لَهُ بِالتَّثْبِيتِ، فَإِنَّهُ الْآنَ يُسْأَلُ»

"(দাফনের পর) তোমরা আপন ভাইয়ের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা কর এবং তার জন্য দৃঢ় ও অবিচলতার জন্য দো'আ কর। কারণ, তাকে এখন প্রশ্ন করা হবে"।[83]

৪। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কবরে প্রবেশ করার সময় সূরা ফতিহা পাঠ করার শিক্ষা কাউকে দেন নি, বরং তিনি এ দো'আ শিখায়েছেন:

«السَّلَامُ عَلَيْكُمْ أَهْلَ الدِّيَارِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُسْلِمِينَ، وَإِنَّا، إِنْ شَاءَ اللهُ لَلَاحِقُونَ، أَسْأَلُ اللهَ لَنَا وَلَكُمُ الْعَافِيَةَ»

"হে ঘরের মুমিন-মুসলিম বাসিন্দাগণ! তোমাদের ওপর আল্লাহর শান্তি বর্ষিত হোক। আমরাও আল্লাহ চাহে তো তোমাদের সাথে মিলিত হব।

[83] আবু দাউদ, হাদীস নং ৩২২১, আলবানী রহ. হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন।

আল্লাহর কাছে আমাদের এবং তোমাদের জন্য তাঁর আযাব হতে ক্ষমা চাই”।[84]

এ হাদীস আমাদেরকে এ শিক্ষাই দিচ্ছে যে, মৃতদের জন্য আমরা দো‘আ ও প্রার্থনা করব, তাদের কাছে দো‘আ কিংবা সাহায্য প্রার্থনা করব না।

৫। জীবিতরা আমল করতে পারে মহান আল্লাহ পবিত্র কুরআন এ জন্যই নাযিল করেছেন। আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

﴿لِّيُنذِرَ مَن كَانَ حَيًّا وَيَحِقَّ ٱلۡقَوۡلُ عَلَى ٱلۡكَٰفِرِينَ ٧٠﴾ [يس: ٧٠]

“যাতে তা সতর্ক করতে পারে ঐ ব্যক্তিকে যে জীবিত এবং যাতে কাফিরদের বিরুদ্ধে অভিযোগবাণী প্রমাণিত হয়”। [সূরা ইয়াসীন, আয়াত: ৭০]

[84] সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ৯৭৫।

নিষিদ্ধ কিয়াম বা দাঁড়ানো

আল্লাহর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

«مَنْ أَحَبَّ أَنْ يَتَمَثَّلَ لَهُ الرِّجَالُ بَيْنَ يَدَيْهِ قِيَامًا فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ»

"যে লোক কামনা করে যে, মানুষ তার সম্মানে দাঁড়িয়ে যাক সে যেন তার ঠিকানা আগুনে করে নেয়"।[85]

আনাস রাদিয়াল্লাহু 'আনহু বলেছেন,

«مَا كَانَ شَخْصٌ أَحَبَّ إِلَيْهِمْ مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَكَانُوا إِذَا رَأَوْهُ لَمْ يَقُومُوا لِمَا يَعْلَمُونَ مِنْ كَرَاهِيَتِهِ لِذَلِكَ»

"সাহাবায়ে কেরামের নিকট নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে অধিক প্রিয় আর কেউ ছিলেন না। তথাপি তারা তাঁকে দেখতে পেলে সম্মানার্থে দাড়াতেন না। কারণ, তারা জানতেন এমনটি তিনি অপছন্দ করেন"।[86]

১। হাদীস দু'টি হতে এটা পরিস্কার বুঝা যায় যে, যে মুসলিম তার সম্মানার্থে মানুষের দাঁড়ানোকে কামনা করে, তাহলে এ কাজ তাকে (জাহান্নামের) আগুনে প্রবেশ করাবে। সাহাবায়ে কেরাম নবী সাল্লাল্লাহু

---

[85] 'মুজাম আল-আওসাত, হাদীস নং ৪২০৮। আল্লামা হাইসামী রহ. বলেছেন, ইমাম তাবরানী হাদীসটি 'মুজাম আল-আওসাত ও কাবীরে বর্ণনা করেছেন, তবে সনদে অনেক রাবী আছেন যাদেরকে আমি চিনিনা। মাজমাউজ্জাওয়ায়েদ, ৮/৪০।

[86] মুসনাদে আহমদ, হাদীস নং ১২৩৪৫, আল্লামা শুয়াইব আরনাউত হাদীসটিকে মুসলিমের শর্তানুযায়ী সহীহ বলেছেন।

আলাইহি ওয়াসাল্লামকে গভীরভাবে ভালোবাসতেন। এতদসত্ত্বেও, তাঁকে তাদের সম্মুখে আসতে দেখলে দাঁড়াতেন না। কারণ, সে দাঁড়ানোকে তিনি খুব অপছন্দ করতেন।

২। বর্তমানে মানুষ একে অপরের জন্য দাঁড়াতে অভ্যস্ত হয়ে গেছে। বিশেষ করে উস্তাদ যখন শ্রেণি কক্ষে প্রবেশ করেন অথবা ছাত্ররা তাকে কোথাও দেখতে পায় তখন তার সম্মানার্থে সকলে দাড়িয়ে যায়। কোনো ছাত্র না দাড়ালে তাকে তিরস্কার ও ধিক্কার দেওয়া হয়। দাড়ানো কালে শিক্ষকের নীরবতা অথবা না দাড়ানো ছাত্রকে তিরস্কার করা এটাই প্রমাণ করে যে, তারা নিজেদের জন্য দাঁড়ানোকে পছন্দ করেন। যদি অপছন্দ করতেন তাহলে এসব হাদীস বলে দাড়ানোকে নিরুৎসাহিত করতেন এবং যারা দাড়ায় তাদের নসীহত করতেন। এভাবে তার জন্য বারে বারে দাঁড়ানোর ফলে তার অন্তরে আকাঙ্খা সৃষ্টি হয় যে, ছাত্ররা তার জন্য উঠে দাঁড়াক। কেউ না দাঁড়ালে তার প্রতি অন্তরে বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়।

উল্লিখিত হাদীসের বক্তব্য অনুযায়ী যারা দাড়িয়ে অপরকে সম্মান জানাচ্ছে তারা মূলতঃ সেসব মানুষ শয়তানের সাহায্যকারী, যারা নিজের জন্য এভাবে দাঁড়ানো পছন্দ করে। অথচ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ ব্যাপারে নিষেধ করে বলেছেন,

«لاَ تَكُونُوا عَوْنَ الشَّيْطَانِ عَلَى أَخِيكُمْ»

“তোমরা তোমাদের ভাইয়ের বিরুদ্ধে শয়তানের সাহায্যকারী হয়ো না”।[87]

৩। অনেকে বলেন, আমরা শিক্ষক বা বুজুর্গদের সম্মানে দাড়াই না; বরং তাদের ইলমের সম্মানে দাঁড়াই। আমরা বলব: আপনাদের কি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ইলম এবং তাঁর সাহাবীদের আদব সম্বন্ধে কোনো সন্দেহ আছে? সাহাবীগণতো নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামের সম্মানে দাঁড়াতেন না। ইসলাম এভাবে দাঁড়ানোকে সম্মান প্রদর্শন বলে মনে করে না; বরং হুকুম মান্য করা ও আনুগত্যের মধ্যেই রয়েছে প্রকৃত সম্মান। সালাম করা ও হাত মিলানই ইসলাম সম্মত সম্মান।

৪। অনেক সময় দেখা যায়, মজলিসে কোনো ধনী লোক প্রবেশ করলে মানুষ তার সম্মানে দাঁড়িয়ে যায়। কিন্তু দরিদ্র ব্যক্তির জন্য কেউ দাঁড়ায় না। এমনও হতে পারে, আল্লাহ তা‘আলার কাছে ঐ দরিদ্রের সম্মান সে ধনী ব্যক্তির চেয়ে বেশি। কারণ, আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

﴿إِنَّ أَكۡرَمَكُمۡ عِندَ ٱللَّهِ أَتۡقَىٰكُمۡۚ ١٣﴾ [الحجرات: ١٣]

“তোমাদের মধ্যে আল্লাহর কাছে সেই অধিক মর্যাদাবান যে তোমাদের মধ্যে অধিক তাকওয়া সম্পন্ন”। [সূরা আল-হুজুরাত, আয়াত: ১৩]

---

[87] সহীহ বুখারী, হাদীস নং ৬৭৮১।

অনেকে ভাবে যদি আমরা না দাঁড়াই তাহলে আগমনকারী মনে ব্যাথা পাবেন। তাদের এই বলে বুঝান দরকার যে, দাঁড়ানটাই সুন্নতের বিপরীত; বরং হাত মিলান, সালাম করাই সুন্নাত।

শরী'আতসম্মত কিয়াম বা দাঁড়ান

অনেক সহীহ হাদীস ও সাহাবীদের আমল দ্বারা প্রমাণিত যে, আগমণকারীর অভ্যর্থনার জন্য দাঁড়ানো জায়েয। আসুন আমরা সে হাদীসগুলো বুঝতে চেষ্টা করি এবং সেমতে আমল করারও ।

১। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর আদরের মেয়ে ফাতিমা রাদিয়াল্লাহু 'আনহু আপন পিতার খিদমতে আসলে নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার জন্য দাঁড়াতেন। অনুরূপভাবে যখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার কাছে যেতেন, তখন তিনিও উঠে দাঁড়াতেন। এটা জায়েয এবং জরুরি। কারণ, এটি অতিথির সাথে সাক্ষাত ও তার একরামের জন্য।

রাসূলে সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

«مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَاليَوْمِ الآخِرِ فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ»

"যে ব্যক্তি আল্লাহ ও আখিরাতের ওপর বিশ্বাস রাখে, সে যেন তার অতিথিকে সম্মান করে" ।[88]

তবে এটা শুধুমাত্র বাড়ীর মালিকের জন্য প্রযোজ্য অন্য কারো জন্য নয়।

২। অন্য হাদীসে আছে:

«قُوْمُوْا إِلى سيِّدِكُمْ وَفِي رواية (فانزلوه)»

---

[88] সহীহ বুখারী, হাদীস নং ৬৪৭৫; সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ৪৭।

“তোমাদের সর্দারের জন্য দাঁড়াও।[89] অন্য বর্ণনায় আছে: (এবং তাকে নামিয়ে আন)

এই হাদীসের কারণ, হলো: সা’দ রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু আহত ছিলেন। তাকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইহুদিদের বিচার করার দায়িত্ব দিয়েছিলেন। তিনি গাধার ওপর উঠলেন। যখন তিনি পৌঁছলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আনসারদের বললেন: তোমরা তোমাদের সর্দারের জন্য উঠে দাঁড়াও এবং তাকে নামিয়ে আন। তাই তারা দাঁড়ালেন এবং নামিয়ে আনলেন। এখানে আনসারদের সর্দার সা’দ রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু-কে সাহায্য করার জন্য দাঁড়ানোর প্রয়োজন ছিল, কারণ, তিনি ছিলেন আহত। তাছাড়া রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজে এবং আনসাররা ব্যতীত অন্য কোনো সাহাবী দাঁড়ান নি।

৩। সাহাবী কা‘ব ইবন মালেক রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু সম্বন্ধে বর্ণিত আছে, তিনি মসজিদে প্রবেশ করলেন, সাহাবাগণ সকলে বসা ছিলেন। তিনি প্রবেশ করলে তালহা রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু তার তাওবা কবুল হয়েছে মর্মে সুসংবাদটি প্রদানের উদ্দেশ্যে দাঁড়িয়ে তার দিকে এগিয়ে গেলেন। তাবুক যুদ্ধে অংশ গ্রহণ না করার কারণে কা’ব রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু ও তার দুই সাথীর সাথে বয়কট করা হয়েছিল। পরে তাদের তাওবা কবুল হয়। এখানে দৃশ্যতঃ দেখা যাচ্ছে তালহা রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু কা’ব রাদিয়াল্লাহু ‘আনহুর উদ্দেশ্যে দাঁড়িয়েছেন, প্রেক্ষাপটের বিচারে এ

---

[89] সহীহ বুখারী, হাদীস নং ৪১২১; সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ১৭৬৮।

দাঁড়ানোতে দোষের কিছু নেই এবং এটা জায়েয। কারণ, এতে বিমর্ষ ব্যক্তিকে খুশি করার চেষ্টা করা হয়েছে এবং আল্লাহ প্রদত্ত নেওয়ামত প্রাপ্তিতে আনন্দ প্রকাশ করা

দঈ‘ফ ও মওদু‘ হাদীস

ইসলামী সমাজে প্রচলিত হাদীসের মাঝে সব হাদীসের মান একই স্তরের নয়। বর্ণনাকারীর অবস্থা ও প্রাসঙ্গিক আরো কিছু কারণে হাদীসের মানের মাঝে তারতম্যের সৃষ্টি হয়েছে। হাদীসবেত্তাগণ সে মান নির্ণয়ের ক্ষেত্রে হাদীসকে অনেকগুলো ভাগে বিভক্ত করেছেন। যেমন, সহীহ, হাসান, দঈ‘ফ ও মওদু‘।

ইমাম মুসলিম তাঁর সহীহ মুসলিমের ভূমিকায় ‘শ্রুত হাদীস পরীক্ষা-নিরীক্ষা না করেই বর্ণনা করা নিষিদ্ধ’ নামক একটি অনুচ্ছেদ কায়েম করেছেন। তাতে তিনি জয়িফ তথা দুর্বল হাদীস বর্ণনা সম্বন্ধে সতর্ক করেছেন। এ প্রসঙ্গে নিম্নোক্ত হাদীসটি উল্লেখ করেছেন,

«كَفَى بِالْمَرْءِ كَذِبًا أَنْ يُحَدِّثَ بِكُلِّ مَا سَمِعَ»

“একজন ব্যক্তির জন্য মিথ্যা হিসাবে এতটুকুই যথেষ্ট যে, যা শুনবে তাই বর্ণনা করবে”।[90]

ইমাম নববী রহ. সহীহ মুসলিমেরর ব্যাখ্যা গ্রন্থে ‘দুর্বল বর্ণনাকারীদের থেকে হাদীস বর্ণনা করা নিষিদ্ধ’ নামক একটি অনুচ্ছেদ কায়েম করেছেন। বক্তব্যের সমর্থনে নিম্নোক্ত হাদীস পেশ করেছেন।

«سَيَكُونُ فِي آخِرِ أُمَّتِي أُنَاسٌ يُحَدِّثُونَكُمْ مَا لَمْ تَسْمَعُوا أَنْتُمْ، وَلَا آبَاؤُكُمْ، فَإِيَّاكُمْ وَإِيَّاهُمْ»

---

[90] সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ৪।

“শেষ যামানায় আমার উম্মতের মধ্যে এমন একদল লোকের আবির্ভাব ঘটবে, যারা তোমাদেরকে এমন সব হাদীস বর্ণনা করবে যা তোমরা কখনও শোন নি এবং তোমাদের বাপ-দাদারাও শোনে নি। সুতরাং তাদের থেকে সতর্ক থেকো”। [91]

ইবন হিব্বান রহ. তার সহীহ হাদীস গ্রন্থে বলেছেন, সে ব্যক্তির জন্য জাহান্নামে প্রবেশ করা অবধারিত যে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নামে এমন কথা বর্ণনা করল যার সত্যতা সম্পর্কে সে অজ্ঞ।

তার সমর্থনে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করেছেন:

«مَنْ قَالَ عَلَيَّ مَا لَمْ أَقُلْ فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ»

“যে ব্যক্তি আমার ওপর এমন কথা চাপিয়ে দিল যা আমি বলি নি, সে যেন তার ঠিকানা জাহান্নামে করে নেয়”।[92]

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উম্মতকে মওদু‘ হাদীস সম্বন্ধে সাবধান করে বলেছেন,

«إِنَّ كَذِبًا عَلَيَّ لَيْسَ كَكَذِبٍ عَلَى أَحَدٍ، مَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّدًا، فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ

---

[91] সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ৬।

[92] মুসনাদ আহমদ, হাদীস নং ৪৬৯, আল্লামা শুয়াইব আরনাউত হাদিসের সনদটিকে হাসান বলেছেন।

النَّارِ»

"যে ব্যক্তি ইচ্ছাকৃত আমার ওপর মিথ্যা বলবে, সে যেন তার ঠিকানা (জাহান্নামের) আগুনে বানিয়ে নেয়"।[93]

বড়ই দুঃখের বিষয়, বহু আলিম এই জাতীয় (জাল ও দুর্বল) হাদীস নিয়ে আলোচনা করেন নিজস্ব মাজহাবি চিন্তা-ভাবনা কে মজবুত করার জন্য।

যেমন, নিম্নোক্ত বক্তব্যটি হাদীস বলে বর্ণনা করে থাকেন,

اخْتِلافُ أُمَّتِي رَحْمَةٌ

"আমার উম্মতের মতবিরোধ রহমতস্বরূপ"।

আল্লামা ইবন হাজম রহ. এ সম্বন্ধে বলেছেন, এটা কোনো হাদীসই নয়, বরং তা বাতিল, মিথ্যা ও বানোয়াট। মতবিরোধ যদি রহমত হয় তাহলে মতৈক্য কী? অভিশাপ? ইসলাম ঐক্য প্রতিষ্ঠা ও মতবিরোধ থেকে বাঁচার জন্য কতভাবেই না উৎসাহিত করেছে।

আরেকটি জাল হাদীস, যাদু বিদ্যা শিখ, কিন্তু তার আমল কর না।

আরো একটি হাদীস লোক মুখে খুব শুনা যায়,

جَنِّبُوا مَسَاجِدَكُمْ صِبْيَانَكُمْ وَمَجَانِيْنَكُمْ.

"তোমরা তোমাদের বাচ্চা ও পাগলদের মসজিদ থেকে দুরে রাখ"।

---

[93] সহীহ বুখারী, হাদীস নং ১২৯১; সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ৩।

ইবন হাজার আসকালানী রহ.-এর মতে এটি দুর্বল। ইবনুল জাওযির মতে সহীহ না। আল্লামা আব্দুল হকের মতে ভিত্তিহীন।

কারণ, এটি সহীহ হাদীস ও ইসলামী চেতনা বিরুদ্ধ বক্তব্য, সহীহ হাদীসে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

«مُرُوا أَوْلَادَكُمْ بِالصَّلَاةِ وَهُمْ أَبْنَاءُ سَبْعِ سِنِينَ، وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا، وَهُمْ أَبْنَاءُ عَشْرٍ»

"তোমাদের সন্তানদের সাত বছর হলেই সালাত শিক্ষা দাও আর তা আদায় না করলে দশ বছর বয়স হতে প্রহার কর"। [94]

সালাতের তালিমতো মসজিদেই হবে, যেমন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর সাহাবীদের সালাত শিখিয়েছেন মসজিদের মিম্বারে বসে। তখন বালকরাও মসজিদে ছিল, এমনকি ছোট ছোট শিশুরাও।

১। হাদীস বর্ণনার ক্ষেত্রে শুধু এটুকু বলাই যথেষ্ট নয় যে, ইমাম তিরমিযি বা আবু দাউদ প্রমুখ বর্ণনা করেছেন। কারণ, তাদের বর্ণনাকৃত হাদীসের মধ্যে দুর্বল হাদীসও রয়েছে। তাই সাথে সাথে হাদীসের স্তরও উল্লেখ করতে হবে। যেমন: সহীহ হাসান অথবা দুর্বল। আর বুখারি ও মুসলিমের হাদীস বর্ণনার ক্ষেত্রে শুধু নাম বললেই চলবে । কারণ, তাদের কিতাবে বর্ণিত সব হাদীসই সহীহ।

২। দুর্বল হাদীস সম্বন্ধে এমন ধারণা করতেই আলিমগণ বলেছেন যে এটি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে প্রমাণিত নয়। সনদ

---

[94] আবু দাউদ, হাদীস নং ৪৯৫, আল্লামা আলবানী রহ. হাদীসটিকে হাসান সহীহ বলেছেন।

কিংবা মূল হাদীসে সমস্যা থাকার কারণেই এসব হাদীসকে পরিহার করতে হবে।

আচ্ছা... আমাদের কেউ যদি গোশত কেনার জন্য বাজারে গিয়ে চর্বি ও হাড্ডিযুক্ত দু'ধরণের গোশত দেখতে পায় তাহলে সে কোনটি কিনবে? অবশ্যই ভালোটি। আর দোষযুক্তটি বাদ দিবে।

কোরবানি দেওয়ার ক্ষেত্রে ইসলাম আমাদেরকে মোটা ও সুস্থ পশু নির্বাচন করার নির্দেশ দিয়েছে আর অসুস্থ পশু পরিহার করতে বলেছে।

দুনিয়াবি বিষয়ে যদি আমরা এমন পরীক্ষা নিরীক্ষা করে চলি, ভালোটি গ্রহণ করি মন্দটি এড়িয়ে যাই। তাহলে দীনের বিষয়াদি সম্বন্ধে আমাদের কেমন সচেতন ও সতর্ক হওয়া উচিৎ। যাতে আমাদের ঈমান ও আকিদার প্রশ্ন জড়িত? সুতরাং এসব দীনি ব্যাপারে কীভাবে দুর্বল হাদীস গ্রহণযোগ্য হতে পারে? বিশেয়ত: যখন সহীহ হাদীস পাওয়া যায়?

দুর্বল হাদীস বর্ণনার ক্ষেত্রে আলিমগণ মূলনীতি নির্ধারণ করে বলেন, দুর্বল হাদীস বর্ণনার সময় এমনটি বলা যাবে না যে, এটি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন। বরং বলতে হবে বর্ণিত আছে বা এ জাতীয় কিছু, যাতে সহীহ ও দুর্বলের মধ্যে পার্থক্য হয়ে যায়।

৩। পরবর্তী যুগের কতিপয় আলিম দুর্বল হাদীস গ্রহণ করার ক্ষেত্রে কিছু শর্ত আরোপ করেছেন।

(ক) দুর্বলতা খুব বেশি হওয়া যাবে না।

(খ) হাদীসটি শুধু কোনো আমলের ফযীলত সম্পর্কিত হবে।

(গ) বর্ণিত হাদীসের মূল বক্তব্য কোনো সহীহ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হতে হবে।

(ঘ) আমলের সময় একে নবীজীর সুন্নত জ্ঞান করা যাবে না।

কিন্তু বর্তমানে লোকেরা দুর্বল হাদীসের ব্যাপারে উপরোক্ত শর্তগুলো মেনে চলছে না।

কিছু মওদু‘ বা বানোয়াট হাদীস

১। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন তাঁর নূর হতে একমুষ্ঠি নূর নিয়ে বললেন: মুহাম্মাদ হয়ে যাও, (আর তিনি হয়ে গেলেন)।

২। হে জাবের! আল্লাহ তা‘আলা সর্ব প্রথম সৃষ্টি করেন তোমার নবীর নূর।

৩। যে হজ করল কিন্তু আমার যিয়ারত করল না, সে আমার ওপর যুলুম করল।

এ পর্যায়ে আমরা সহীহ, হাসান ও দুর্বল হাদীস সম্পর্কে কিছু আলোচনা করব।

সহীহ: হাদীস সহীহ হবার জন্য পাঁচটি শর্ত আছে:

১। সনদের পরম্পরা নিরবচ্ছিন্ন হতে হবে, অর্থাৎ প্রত্যেক রেওয়ায়াতকারী তার উপরের রিওয়ায়াতকারী হতে সরাসরি শুনতে হবে।

২। প্রত্যেক বর্ণনাকারীকে আদেল অর্থাৎ মুসলিম, বালেগ, ন্যায় পরায়ন ও জ্ঞানী হতে হবে, ফাসিক এবং চরিত্রহীন হলে চলবে না।

৩। প্রতিটি বর্ণনাকারীর মেধা ও স্মরণশক্তি অত্যন্ত প্রখর হতে হবে। মেধা ও স্মরণশক্তিতে কোনরূপ দুর্বলতা থাকলে বর্ণিত হাদীস আর সহীহ বলে বিবেচিত হবে না।

৪। হাদীসে এমন কথা থাকবে না, যা তার থেকে বেশি নির্ভরযোগ্য বর্ণনাকারীদের বিরোধিতা করে।

৫। এমন কোনো বিষয় থাকবে না যা হাদীসের মধ্যে কোনো দোষ বের করে দেয়।

সংক্ষেপে: উক্ত হাদীস, যার সনদ যুক্ত থাকবে ন্যায় পরায়ন, সম্পূর্ণ মুখস্থকারী বর্ণনাকারীদের দ্বারা (প্রথম হতে শেষ পর্যন্ত) এবং তাতে কোনো ব্যতিক্রম কিংবা দোষ থাকবে না।

সহীহ হাদীসের ওপর আমলের হুকুম

১। এর ওপর আমল করা ওয়াজিব ।

২। এটি শরী'আতের দলীল হিসাবে গণ্য হবে।

৩। কোনো আমলের ক্ষেত্রে সহীহ হাদীস পাওয়া গেলে তা বাদ দিয়ে দুর্বল হাদীসের ওপর আমল করা অবৈধ।

হাসান হাদীস

ঐ হাদীস যার সনদের পরম্পরা সম্পর্কযুক্ত আদেল তথা ন্যায় পরায়ন বর্ণনাকারীদের সাথে যাদের স্মরণশক্তি একটু কম থাকতে পারে, কিন্তু কোনো ব্যতিক্রম বা দোষ থাকবে না। অর্থাৎ তাতে সহীহ হাদীসে বর্ণিত শব্দসমূহ সরাসরি ব্যবহার না করে হয়ত কোনো প্রতিশব্দ ব্যবহৃত হয়েছে।

হাসান হাদীসের ওপর আমলের হুকুম

১। এর হুকুম সহীহ হাদীসের মতোই।

২। এটি দলীল হিসাবে গণ্য হবে যদিও তা সহীহ থেকে একটু দুর্বল।

৩। এর ওপর আমল করাও ওয়াজিব।

দুর্বল হাদীস

যে হাদীসের মধ্যে হাসান হাদীসের কোনো শর্ত বাদ পড়ে গেছে তাকে দুর্বল হাদীস বলে।

এর শ্রেণিভেদ হলো:

(১) দুর্বল (২) বেশি দুর্বল, (৩) ওয়াহী বা ক্ষণভঙ্গুর, (৪) মুনকার এবং (৫) মওদু‘ বা বানোয়াট। এটিই সবচেয়ে নিকৃষ্ট।

আমরা কবর যিয়ারাত করব কীভাবে?

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

«إِنِّي كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ فَزُورُوهَا، وَلْتَزِدْكُمْ زِيَارَتُهَا خَيْرًا»

“আমি তোমাদের কবর যিয়ারত করতে নিষেধ করেছিলাম। কিন্তু এখন যিয়ারত কর, যাতে ইহা তোমাদেরকে ভালো কাজের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়”।[95]

১। কবরস্থানে প্রবেশ কিংবা পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় সুন্নাত হচ্ছে তাদের সালাম করা এবং তাদের জন্য দো‘আ করা।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর সাহাবীদের শিখিয়েছেন:

«السَّلَامُ عَلَيْكُمْ أَهْلَ الدِّيَارِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُسْلِمِينَ، وَإِنَّا، إِنْ شَاءَ اللهُ لَلَاحِقُونَ، أَسْأَلُ اللهَ لَنَا وَلَكُمُ الْعَافِيَةَ»

“হে ঘরের মুমিন-মুসলিম বাসিন্দাগণ! তোমাদের ওপর আল্লাহর শান্তি বর্ষিত হোক। আমরাও আল্লাহ চাহে তো তোমাদের সাথে মিলিত হব। আল্লাহর কাছে আমাদের এবং তোমাদের জন্য তাঁর আযাব হতে ক্ষমা চাই”।[96]

---

[95] সুনান নাসাঈ, হাদীস নং ৪৪২৯, আলবানী রহ. হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন।

[96] সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ৯৭৫।

২। কবরের উপর বসা নিষেধ এবং তার ওপর দিয়ে চলাফেরা করার রাস্তা বানানোও নিষেধ। কারণ, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

«لَا تَجْلِسُوا عَلَى الْقُبُورِ، وَلَا تُصَلُّوا إِلَيْهَا»

“তোমরা কবরের উপর বস না এবং তার উপর সালাত আদায় কর না”।[97]

৩। নৈকট্য লাভের আশায় কবরের চারপাশে তাওয়াফ করা নিষেধ।

কারণ, আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

﴿وَلۡيَطَّوَّفُواْ بِٱلۡبَيۡتِ ٱلۡعَتِيقِ ٢٩﴾ [الحج: ٢٩]

“তারা যেন প্রাচীন ঘরের (কাবার) চার পার্শ্বে তাওয়াফ করে”। [সূরা আল-হজ, আয়াত: ২৯]

৪। কবরস্থানে কুরআন তিলাওয়াত করা নিষেধ। কারণ, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

«لَا تَجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ مَقَابِرَ، إِنَّ الشَّيْطَانَ يَنْفِرُ مِنَ الْبَيْتِ الَّذِي تُقْرَأُ فِيهِ سُورَةُ الْبَقَرَةِ»

“তোমরা বাসস্থানসমূহকে কবরস্থান বানাবে না। কারণ, শয়তান সেসব বাড়ী হতে পলায়ন করে যেখানে সূরা বাকারা পাঠ করা হয়”।[98]

---

[97] সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ৯৭২।

[98] সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ৭৮০।

এ হাদীস দ্বারা এটাই বুঝা যায় যে, কবরস্থান কুরআন পাঠের স্থান নয়, বরং কুরআন তিলাওয়াতের স্থান হচ্ছে নিজ নিজ বাসস্থান। যে সব হাদীসে কবরস্থানে কুরআন পাঠের কথা বলা হয়েছে সেগুলো সঠিক নয়।

৫। মৃতদের কাছ থেকে মদদ বা সাহায্য চাওয়া বড় শির্ক। যদিও সে নবী কিংবা ওলী হয়। এ সম্বন্ধে আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

﴿وَلَا تَدۡعُ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَا لَا يَنفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَۖ فَإِن فَعَلۡتَ فَإِنَّكَ إِذٗا مِّنَ ٱلظَّٰلِمِينَ ١٠٦﴾ [يونس: ١٠٦]

“আর আল্লাহ ছাড়া এমন কিছুকে ডেকো না, যা তোমার উপকার করতে পারে না এবং তোমার ক্ষতিও করতে পারে না। যদি তুমি কর, তাহলে নিশ্চয় তুমি জালিমদের অন্তর্ভুক্ত হবে”। [সূরা ইউনুস, আয়াত: ১০৬]

৬। কবরের উপর ফুলের তোড়া দেওয়া কিংবা কবরস্থানে তা স্থাপন না করা নাজায়েয।

কারণ, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অথবা সাহাবীগণ কেউ এমনটি করেন নি। তাছাড়া এতে খৃষ্টানদের অনুকরণ হয় এবং এটি অপচয় অপব্যয়ের রাস্তা। এসব টাকা-পয়সা যদি অনাথ-গরীবদেরকে দেওয়া হত তবে তারা উপকৃত হত এবং অনুমোদিত জায়গায় ব্যয় নিশ্চিত হত।

৭। কবরের ওপর কোনো সৌধ বানানো বা সৌন্দর্য বর্ধনের জন্য দেওয়াল দেওয়া জায়েয নেই। তাতে কুরআনের আয়াত কিংবা কবিতা

লেখাও নিষেধ। তবে ইট, পাথর কিংবা মাটি দিয়ে এক বিঘত পরিমাণ উঁচু করা জায়েয, যাতে মানুষ বুঝতে পারে যে এটি কবর।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উসমান ইবন মাজউনের কবরকে এরূপ করেছিলেন, যাতে মানুষ কবর বলে বুঝতে পারে।

অন্ধ অনুসরণ

আলালাহ তা'আলা বলেন,

﴿وَإِذَا قِيلَ لَهُمۡ تَعَالَوۡاْ إِلَىٰ مَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ وَإِلَى ٱلرَّسُولِ قَالُواْ حَسۡبُنَا مَا وَجَدۡنَا عَلَيۡهِ ءَابَآءَنَآۚ أَوَلَوۡ كَانَ ءَابَآؤُهُمۡ لَا يَعۡلَمُونَ شَيۡـٔٗا وَلَا يَهۡتَدُونَ ١٠٤﴾ [المائدة: ١٠٤]

"আর যখন তাদেরকে বলা হয়, আল্লাহ যা নাযিল করেছেন তার দিকে ও রাসূলের দিকে আস, তারা বলে, 'আমরা আমাদের পিতৃপুরুষদের যার ওপর পেয়েছি তাই আমাদের জন্য যথেষ্ট। যদিও তাদের পিতৃপুরুষরা কিছুই জানত না এবং হিদায়াতপ্রাপ্ত ছিল না তবুও?" [সূরা আল-মায়েদা, আয়াত: ১০৪]

১। আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে মুশরিকদের অবস্থা বর্ণনা করেছেন। যখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদেরকে কুরআন, আল্লাহর একত্ববাদ ও একমাত্র আল্লাহর নিকট দো'আর প্রতি ডেকেছিলেন, তখন তারা বলেছিল, আমাদের জন্য আমাদের বাপ-দাদাদের আকিদাই যথেষ্ট। পবিত্র কুরআন তাদের প্রতিবাদ করে বলছে: তোমাদের বাপ দাদারা ছিল জাহেল বা অজ্ঞ।

২। বর্তমান যুগে বহু মুসলিমই এই ধরণের অন্ধ অনুসরণের শিকারে পরিণত হয়েছে। লেখক বলেছেন,

একবার এক দায়ীকে আল্লাহর অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ নেই মর্মে দলিল উপস্থাপন করতে দেখেছি, সে ঘোষণা করছে, তোমাদের বাপ-দাদারা কি জানতেন

যে, আল্লাহর হাত আছে? বাপ-দাদার প্রসঙ্গ টেনে সে অস্বীকার করতে চাচ্ছে যে আল্লাহর হাত নেই; কিন্তু পবিত্র কুরআন তা প্রমাণ করেছে।

আল্লাহ তা‘আলা আদম ‘আলাইহিস সালামের সৃষ্টি সম্বন্ধে শয়তানকে উদ্দেশ্য করে বলেন,

﴿مَا مَنَعَكَ أَن تَسۡجُدَ لِمَا خَلَقۡتُ بِيَدَيَّۖ ۝٧٥﴾ [ص: ٧٥]

“যাকে আমি নিজ হাতে সৃষ্টি করেছি তাকে সেজদা করতে তোমাকে কোন জিনিস নিষেধ করল”। [সূরা সোয়াদ, আয়াত: ৭৫]

কিন্তু আল্লাহর হাত সৃষ্টির হাত হতে ভিন্ন। একটির সাথে আরেকটির তুলনা চলে না। তাঁর হাত সম্বন্ধে তিনিই জানেন। যেমনটি তার সাথে প্রযোজ্য সেটি তেমনই।

আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

﴿لَيۡسَ كَمِثۡلِهِۦ شَيۡءٞۖ وَهُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلۡبَصِيرُ ۝١١﴾ [الشورى: ١١]

“তাঁর মতো কিছুই নেই আর তিনি সর্বশ্রোতা সর্বদ্রষ্টা”। [সূরা আশ-শূরা, আয়াত: ১১]

৩। আরো একটি মন্দ ও ক্ষতিকর অনুসরণ হচ্ছে পাপ কাজে কাফিরদের অনুসরণ।

যেমন মুসলিম রমণীরা আজ তাদের অনুসরণে রাস্তা-ঘাট, হাট-বাজারে সংকীর্ণ পোষাক পরে খোলা মেলা ভাবে ঘুরে বেড়াচ্ছে। চাল-চলন, পোশাক-আশাক, কথা-বার্তা ইত্যাদিতে আজ মুসলিমরা কাফিরদেরকে

আদর্শ জ্ঞান করে তাদের অনুসরণ করছে। হায়! যদি তারা উপকারী সামগ্রী আবিষ্কার ও নির্মাণ যেমন বিমান তৈরি ইত্যাদি ক্ষেত্রে তাদের অনুসরণ করত তাহলে তা তাদের উপকারে আসত।

আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تُقَدِّمُواْ بَيۡنَ يَدَيِ ٱللَّهِ وَرَسُولِهِۦۖ ١﴾ [الحجرات: ١]

“হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের সামনে অগ্রবর্তী হয়ো না”। [সূরা আল-হুজরাত, আয়াত: ১]

সত্যকে প্রত্যাখান কর না

১। নিশ্চয় আল্লাহ রাব্বুল আলামীন রাসূলদেরকে মানুষের কল্যাণের জন্য পাঠিয়েছেন। তাদের হুকুম করেছেন তার ইবাদত ও একত্ববাদের দিকে লোকদের আহ্বান করতে; কিন্তু অধিকাংশ লোকই তাঁদের কথা অমান্য করেছে এবং তাঁরা যে সত্য তথা তাওহীদের দিকে ডেকেছেন তা প্রত্যাখ্যান করেছে। তাই তাদের পরিণতি হয়েছিল ধ্বংস।

২। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

«لاَ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ مِنْ كِبْرٍ.ثُمَّ قَالَ: الْكِبْرُ بَطَرُ الْحَقِّ وَغَمَطُ النَّاسِ».

“যার অন্তরে অণু পরিমাণও অহঙ্কার থাকবে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে না। তারপর বলেছেন, অহঙ্কার হচ্ছে সত্যকে প্রত্যাখান করা ও মানুষকে নিকৃষ্ট চোখে দেখা”।[99]

৩। সত্য গ্রহণ করা ওয়াজিব। তা যে কেউ বলুক না কেন। এমনকি শয়তান বললেও।

হাদীস শরীফে আছে: আবূ হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন,

«وَكَّلَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِحِفْظِ زَكَاةِ رَمَضَانَ، فَأَتَانِي آتٍ فَجَعَلَ يَحْثُو مِنَ الطَّعَامِ فَأَخَذْتُهُ، وَقُلْتُ: وَاللَّهِ لَأَرْفَعَنَّكَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: إِنِّي مُحْتَاجٌ، وَعَلَيَّ عِيَالٌ وَلِي حَاجَةٌ شَدِيدَةٌ، قَالَ: فَخَلَّيْتُ عَنْهُ، فَأَصْبَحْتُ، فَقَالَ

---

[99] সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ৯১।

النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «يَا أَبَا هُرَيْرَةَ، مَا فَعَلَ أَسِيرُكَ البَارِحَةَ»، قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، شَكَا حَاجَةً شَدِيدَةً، وَعِيَالًا، فَرَحِمْتُهُ، فَخَلَّيْتُ سَبِيلَهُ، قَالَ: «أَمَا إِنَّهُ قَدْ كَذَبَكَ، وَسَيَعُودُ»، فَعَرَفْتُ أَنَّهُ سَيَعُودُ، لِقَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّهُ سَيَعُودُ، فَرَصَدْتُهُ، فَجَاءَ يَحْثُو مِنَ الطَّعَامِ، فَأَخَذْتُهُ، فَقُلْتُ: لَأَرْفَعَنَّكَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: دَعْنِي فَإِنِّي مُحْتَاجٌ وَعَلَيَّ عِيَالٌ، لاَ أَعُودُ، فَرَحِمْتُهُ، فَخَلَّيْتُ سَبِيلَهُ، فَأَصْبَحْتُ، فَقَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «يَا أَبَا هُرَيْرَةَ، مَا فَعَلَ أَسِيرُكَ»، قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ شَكَا حَاجَةً شَدِيدَةً، وَعِيَالًا، فَرَحِمْتُهُ، فَخَلَّيْتُ سَبِيلَهُ، قَالَ: «أَمَا إِنَّهُ قَدْ كَذَبَكَ وَسَيَعُودُ»، فَرَصَدْتُهُ الثَّالِثَةَ، فَجَاءَ يَحْثُو مِنَ الطَّعَامِ، فَأَخَذْتُهُ، فَقُلْتُ: لَأَرْفَعَنَّكَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ، وَهَذَا آخِرُ ثَلاَثِ مَرَّاتٍ، أَنَّكَ تَزْعُمُ لاَ تَعُودُ، ثُمَّ تَعُودُ قَالَ: دَعْنِي أُعَلِّمْكَ كَلِمَاتٍ يَنْفَعُكَ اللَّهُ بِهَا، قُلْتُ: مَا هُوَ؟ قَالَ: إِذَا أَوَيْتَ إِلَى فِرَاشِكَ، فَاقْرَأْ آيَةَ الكُرْسِيِّ: {اللَّهُ لاَ إِلَهَ إِلَّا هُوَ الحَيُّ القَيُّومُ} [البقرة: 255]، حَتَّى تَخْتِمَ الآيَةَ، فَإِنَّكَ لَنْ يَزَالَ عَلَيْكَ مِنَ اللَّهِ حَافِظٌ، وَلاَ يَقْرَبَنَّكَ شَيْطَانٌ حَتَّى تُصْبِحَ، فَخَلَّيْتُ سَبِيلَهُ، فَأَصْبَحْتُ فَقَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَا فَعَلَ أَسِيرُكَ البَارِحَةَ»، قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، زَعَمَ أَنَّهُ يُعَلِّمُنِي كَلِمَاتٍ يَنْفَعُنِي اللَّهُ بِهَا، فَخَلَّيْتُ سَبِيلَهُ، قَالَ: «مَا هِيَ»، قُلْتُ: قَالَ لِي: إِذَا أَوَيْتَ إِلَى فِرَاشِكَ فَاقْرَأْ آيَةَ الكُرْسِيِّ مِنْ أَوَّلِهَا حَتَّى تَخْتِمَ الآيَةَ: {اللَّهُ لاَ إِلَهَ إِلَّا هُوَ الحَيُّ القَيُّومُ} [البقرة: 255]، وَقَالَ لِي: لَنْ يَزَالَ عَلَيْكَ مِنَ اللَّهِ حَافِظٌ، وَلاَ يَقْرَبَكَ شَيْطَانٌ حَتَّى تُصْبِحَ - وَكَانُوا أَحْرَصَ شَيْءٍ عَلَى الخَيْرِ - فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَمَا إِنَّهُ قَدْ صَدَقَكَ وَهُوَ كَذُوبٌ، تَعْلَمُ مَنْ تُخَاطِبُ مُنْذُ ثَلاَثِ لَيَالٍ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ»، قَالَ: لاَ، قَالَ: «ذَاكَ شَيْطَانٌ»

“রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে রমদানের যাকাত হিফাযত করার দায়িত্বে নিযুক্ত করলেন। এক ব্যক্তি এসে আঞ্জলি ভর্তি করে খাদ্যসামগ্রী নিতে লাগল। আমি তাকে পাকড়াও করলাম এবং বললাম, আল্লাহর কসম,

আমি তোমাকে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর কাছে উপস্থিত করব। সে বলল, আমাকে ছেড়ে দিন। আমি খুবই অভাবগ্রস্ত, আমার যিম্মায় পরিবারের দায়িত্ব রয়েছে এবং আমার প্রয়োজন তীব্র। তিনি বললেন, আমি ছেড়ে দিলাম। যখন সকাল হলো, তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন, হে আবূ হুরায়রা, তোমার রাতের বন্দী কী করল? আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ্, সে তার তীব্র অভাব ও পরিবার, পরিজনের কথা বলায় তার প্রতি আমার দয়া হয়, তাই তাকে আমি ছেড়ে দিয়েছি। তিনি বললেন, সাবধান! সে তোমার কাছে মিথ্যা বলেছে এবং সে আবার আসবে। 'সে আবার আসবে' রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর উক্তির কারণে আমি বুঝতে পারলাম যে, সে পুনরায় আসবে। কাজেই আমি তার অপেক্ষায় থাকলাম। সে এল এবং অঞ্জলি ভরে খাদ্যসামগ্রী নিতে লাগল। আমি ধরে ফেললাম এবং বললাম, আমি তোমাকে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর কাছে নিয়ে যাব। সে বলল, আমাকে ছেড়ে দিন। কেননা, আমি খুবই দরিদ্র এবং আমার ওপর পরিবার-পরিজনের দায়িত্ব ন্যস্ত, আমি আর আসবো না। তার প্রতি আমার দয়া হলো এবং আমি তাকে ছেড়ে দিলাম। সকাল হলে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন, হে আবূ হুরায়রা, তোমার রাতের বন্দী কি করল? আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ্, সে তার তীব্র প্রয়োজন এবং পরিবার- পরিজনের কথা বলায় তার প্রতি আমার দয়া হয়। তাই তাকে আমি ছেড়ে দিয়েছি। তিনি বললেন, খবরদার। সে তোমার কাছে মিথ্যা বলেছে এবং সে আবার আসবে। তাই আমি তৃতীয়বার তার অপেক্ষায় রইলাম। সে আবার আসল এবং অঞ্জলি ভর্তি করে খাদ্য সামগ্রী নিতে লাগল। আমি তাকে পাকড়াও করলাম এবং বললাম, আমি তোমাকে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর কাছে অবশ্যই নিয়ে যাব। এ হলো তিন বারের শেষ বার। তুমি প্রত্যেকবার বলো

যে আর আসবে না, কিন্তু আবার আস। সে বলল আমাকে ছেড়ে দিন। আমি তোমাকে কয়েকটি কথা শিখিয়ে দেব। যা দিয়ে আল্লাহ্তোমাকে উপকৃত করবেন। আমি বললাম সেটা কি? সে বলল, যখন তুমি রাতে শয্যায় যাবে তখন আয়াতুল কুরসী পড়বে। তখন আল্লাহর তরফ থেকে তোমার জন্য একজন রক্ষক নিযুক্ত হবে এবং ভোর পর্যন্ত শয়তান তোমার কাছে আসতে পারবে না। কাজেই তাকে আমি ছেড়ে দিলাম। ভোর হলে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে বললেন, গত রাতে তোমার বন্দী কি বলল? আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, সে আমাকে বলল, যে সে আমাকে কয়েকটি বাক্য শিক্ষা দেবে যা দিয়ে আল্লাহ্আমাকে লাভবান করবেন। তাই আমি তাকে ছেড়ে দিয়েছি। তিনি আমাকে বললেন, এই বাক্যগুলো কি? আমি বললাম, সে আমাকে বলল, যখন তুমি রাতে শয্যায় যাবে তখন আয়াতুল কুরসী"

﴿ٱللَّهُ لَآ إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ ٱلۡحَيُّ ٱلۡقَيُّومُۚ لَا تَأۡخُذُهُۥ سِنَةٞ وَلَا نَوۡمٞۚ لَّهُۥ مَا فِي ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَمَا فِي ٱلۡأَرۡضِۗ مَن ذَا ٱلَّذِي يَشۡفَعُ عِندَهُۥٓ إِلَّا بِإِذۡنِهِۦۚ يَعۡلَمُ مَا بَيۡنَ أَيۡدِيهِمۡ وَمَا خَلۡفَهُمۡۖ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيۡءٖ مِّنۡ عِلۡمِهِۦٓ إِلَّا بِمَا شَآءَۚ وَسِعَ كُرۡسِيُّهُ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلۡأَرۡضَۖ وَلَا يَـُٔودُهُۥ حِفۡظُهُمَاۚ وَهُوَ ٱلۡعَلِيُّ ٱلۡعَظِيمُ ٢٥٥﴾ [البقرة: ٢٥٥]

প্রথম থেকে আয়াতের শেষ পর্যন্ত পড়বে এবং সে আমাকে বলল, এতে আল্লাহর তরফ থেকে তোমার জন্য একজন রক্ষক নিযুক্ত থাকবেন এবং ভোর পর্যন্ত তোমার নিকট কোন শয়তান আসতে পারবে না। সাহাবায়ে কেরাম কল্যাণের জন্য বিশেষ লালায়িত ছিলেন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, হ্যাঁ এ কথাটি তো সে তোমাকে সত্য বলেছে, কিন্তু হুশিয়ার, সে মিথ্যুক। হে আবূ হুরায়রা, তুমি কি জান, তিন রাত ধরে তুমি কার সাথে কথাবার্তা বলেছিলে? আবূ হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আ'নহু বললেন, না। তিনি নবী

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, সে ছিল শয়তান। অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আ'নহুকে বায়তুল মালের পাহারাদার বানিয়েছিলেন। রাতে চুরির উদ্দেশ্যে এক চোর আসে। তিনি তাকে ধরে ফেলেন। তখন চোর তার কাছে দয়া ভিক্ষা করতে শুরু করল এবং নিজ দুর্বলতা ও অসহায়ত্বের কথা প্রকাশ করতে লাগল। তাই তিনি তাকে ছেড়ে দিলেন। তারপর দ্বিতীয় দিন এবং তৃতীয় দিনও সে আসল। শেষের দিন তিনি তাকে ধরে বললেন: অবশ্যই আমি তোমাকে নবীজীর কাছে সোপর্দ করব। সে বলল: আমাকে ছেড়ে দাও। আমি তোমাকে এমন একটি আয়াত শেখাব, যা পাঠ করলে শয়তান আর তোমার কাছে আসতে পারবে না। তিনি বললেন: সে আয়াত কোনটি? সে বলল: আয়াতুল কুরসী। যখন আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু 'আনহু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ঘটনাটি শুনালেন, তখন তিনি বললেন: তুমি কি জান সে ব্যক্তি কে? সে শয়তান, তোমাকে সত্য বলেছে, যদিও সে চরম মিথ্যাবাদী"।[100]

সমাপ্ত

[100] সহীহ বুখারী, হাদীস নং ২৩১১।

পূর্ব যুগে মানুষের দুঃখ-দুর্দশা বিশেষতঃ মুসলিমদের কষ্ট-মুসিবত, যুদ্ধ-ফিতনা ইত্যাদির কারণ অনুসন্ধান করে দেখা গেছে যে, তাওহীদ সম্পর্কে জ্ঞানের অপ্রতুলতা, উদাসীনতা ও নানা শির্কী কাজে জড়িয়ে পড়াই ছিল এর মূল কারণ। শির্কমুক্ত তাওহীদের অনুশীলন না থাকার সুযোগটি শয়তান গ্রহণ করেছে এবং তাদের বিভ্রান্ত করে বিভিন্ন বিপদে ফেলতে সক্ষম হয়েছে। তাই এ ছোট্ট বইটিতে লেখক পাঠকের সুবিধার কথা বিবেচনা করে তাওহীদ, শির্কসহ ইসলামের বেশ কিছু মৌলিক ও গুরুত্বপূর্ণ বিষয় সংক্ষেপে উপস্থাপন করেছেন, যাতে তারা বিষয়গুলো সহজে বুঝতে পারে।